

# মামু

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৪৬ • অক্টোবর ২০০৫



# ডায়ারী



## ভূত ভবিষ্যতের সময়যান



সমুদ্রের সন্ত্রাস হাপ্স ■ ভায়োলেন্স ও মানসিক রোগ ■ হ্যারিকেন ক্যাটরিনা  
ভয়ঙ্কর আমাজান ■ পুরুষের শরীরেও জীবিত দ্রুণ ■ আসছে ইলেক্ট্রনিক বোমা



## এ সংখ্যার সূচি

সম্পাদক  
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নিবাহী সম্পাদক  
আতাউর রহমান কারুল

সহযোগী সম্পাদক  
এস এম মুকুল

সহকারী সম্পাদক  
সরোয়ার হোসেন  
গৌতম রায়

অতিথি লেখক  
মাসুদ কামাল  
ড. অরুণ রতন চৌধুরী  
ডা. মিজানুর রহমান কন্ডোল

নিয়মিত লেখক  
আসিফ, রেহানা পারভীন রুমা  
পারভীন সুলতানা, শান্তা মারিয়া  
ফারহানা মিলি, হিটলার এ হালিম  
মাহবুব আনোয়ার শওকত, শফি ইসলাম  
মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাদাত শাহরিয়ার  
এ কে এম মুনির হোসেন  
আনোয়ারুল হক খান

সার্কুলেশন  
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

সম্পাদকীয় কার্যালয়  
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা,  
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০  
ফোন : ৭১৭৫০৯৫  
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭১৭৫০৯৫  
বিপণন  
৩৭/১, বাংলাবাজার  
দ্বিতীয় তলা, ঢাকা-১১০০  
ফোন : ৭১২৫০৫৪, ০১৭১-১২০৭০১

মূল্য : পনের টাকা

প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৮/৩  
কম্পিউটার কমপ্লেক্স, তৃতীয় তলা,  
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে  
সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন  
কর্তৃক প্রকাশিত।

ই-মেইল : editor\_sworld@yahoo.com



## ভূত ভবিষ্যতের সময়যান

—এস এম শামসুজ্জোহা



## ভায়েলেন্স ও মানসিক রোগ

—আসিফ আনোয়ার

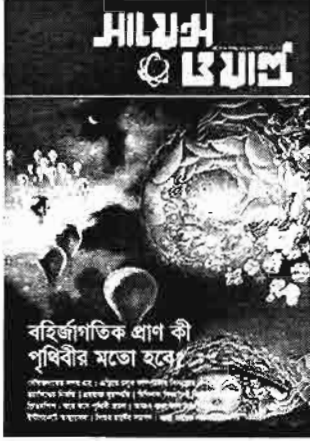
## অন্যান্য রচনা

<p>রোয়ায় স্বাস্থ্যসম্মত সেহরি ও ইফতার —ডা. মিজানুর রহমান কন্ডোল /৮ টি-৯ প্রযুক্তি মোবাইল অভিধান —এইচ রেজা /৯ ধূমপানে টিনএজারদের বিপদ বেশি —গৌতম রায় /১০ অ্যাজেমিডা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী —মোঃ জসীম উদ্দীন খান /১২ হ্যারিকেন ক্যাটরিনা —নুসরাত রহমান /১৭ অনলাইন ফিল্টার কতটা জরুরি? —রুহিয়া আখতার/২০ ডেবু থেকে সাবধান —হারুন-অর-রশিদ সিদ্দিকী /২২</p>	<p>আসছে ইলেক্ট্রনিক বোমা —হীরক চৌধুরী /২৭ হীরক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী —মনীষা রায় /২৮ পুরুষের শরীরেও জীবন্ত ভ্রূণ! —ফরিদুর রহমান পাশু /৩০ অনলাইন প্রতারণা —হাসিব হাসান/৩৪ এলজেইমার প্রতিরোধক বি-ভিটামিন ফোলেট —প্রাণ কানাই রায় চৌধুরী/৩৭ মোবাইল কমার্স —এ কে এম মনির হোসেন/৩৮ গ্রিন হাউজ প্রভাব এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ —আসিফ/৪০ সমুদ্রের সম্ভ্রাস হাসর —হাসিব রেজা রনি/৪২</p>
--	---

## নিয়মিত বিভাগ

৩ চিঠিপত্র	বিতর্ক ৩৬
৪ বিজ্ঞান বিশ্বের নতুন খবর	বিজ্ঞান কুইজ ৪৭
২৪ বিজ্ঞান প্রজ্ঞা	সায়েন্স ফিকশন : ড্যাম্পারের নক্ষত্রযাত্রা ৪৪





## টেলিস্কোপ সম্পর্কে একটি সংখ্যা চাই

সায়ের্স ওয়ার্ল্ড মহাকাশ ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি ব্যক্তিগত মাসিক পত্রিকা হলেও এতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় আমার মতে অনেক বেশি। আপনার যদি পত্রিকাটিতে বিজ্ঞাপন ব্যাপক প্রকাশ না করে যদি নতুন কোন বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় নিয়ে কোনো নতুন বিভাগ খুললে বিজ্ঞানের নানান বিষয় সম্পর্কে প্রচুর তথ্য থাকবে। তাহলে পত্রিকাটি ব্যাপক হারে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। আপনার নিকট আমার অনুরোধ থাকবে, সামনে কোনো সংখ্যায় টেলিস্কোপের ওপর কোনো প্রচ্ছদ বা পার্শ্ব রচনা প্রকাশ করবেন। যাতে টেলিস্কোপের আবিষ্কারক ও আবিষ্কারের কাহিনী, বিশ্বে বৃহৎ টেলিস্কোপ কোথায় ও কোন দেশ তা ব্যবহার করে, টেলিস্কোপ কত প্রকারের হয়, রেডিও টেলিস্কোপের কার্যপ্রণালী, বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপের সাহায্যে কিভাবে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করেন প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। বাসায় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হয় তাদের ধরন, গঠন বা বৈশিষ্ট্য এবং এ ধরনের টেলিস্কোপ কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, দাম কত ইত্যাদি বিষয় যদি একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন তাহলে আমার মতো আরো অনেকে মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত এই যন্ত্রটি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। আমার বিশ্বাস সায়ের্স ওয়ার্ল্ড এই ক্ষুদ্র অনুরোধ রাখবে।

ফেরদৌস আহমদ (রকি)

১/এ/১ মিরবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

# আপনার প্রস্তাবিত বিষয়টি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও তা গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করব।

## কৃষি প্রযুক্তি

পত্রের শুরুতে সালাম নিবেন। আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের একজন কৃতি ছাত্র। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সফলতা অর্জন করেছি। বিজ্ঞান বিষয়ক 'সায়ের্স ওয়ার্ল্ড' আমার প্রিয় পত্রিকা। আমি ইতোমধ্যে আপনারদের সদস্য হয়েছি। এই পত্রিকায় বিভিন্ন গবেষণামূলক ও আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে লেখা হলেও কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক লেখা কম হয়। এছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিনাতে কৃষি বিষয়ক বহু গবেষণা, আঞ্চলিক সাফল্য ও সাফল্যের পথে অনেক প্রযুক্তি ও প্রজেক্ট রয়েছে। কিছু ইতিমধ্যে সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মহোদয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন। আমার প্রচুর ইচ্ছা, "সায়ের্স ওয়ার্ল্ড" প্রতিকার কৃষি বিষয়ক একটি বিভাগ খোলা উচিত এবং আমি কৃষি বিষয়ক 'রচনার' নিয়মিত লেখন হতে চাই। এর জন্য কি করা দরকার এবং উপরিস্থিত বিষয়টি বিবেচনা করে একটি বিভাগ খোলা যায় কি না, জানালে খুশি হবে।

মোঃ গুলশান আনোয়ার প্রধান

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

# কৃষি বিষয়ক লেখা আমরা ছাপাতে চাই। আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন।

## পারমাণবিক বোমা

আমি সায়ের্স ওয়ার্ল্ড-এর একজন নিয়মিত পাঠক এবং সদস্য। দুই মাস হিসেবে একটি প্রস্তাব রাখছি। আমরা সবই জ্ঞান পারমাণবিক বোমা: বিশ্বের মানব সভ্যতার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে:

১. পারমাণবিক অস্ত্র/বোমা কিভাবে তৈরি করা হয়?
২. এটা মানুষ ও পরিবেশের কি ক্ষতি করে?
৩. এটা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়?

সায়ের্স ওয়ার্ল্ড-এর ধারাবাহিক "তথ্য প্রযুক্তি" নিরিখে সম্পর্কে লেখা আন্তর্জাতিক এবং পারমাণবিক বোমা নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য মাননীয় সম্পাদকের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

এইচ.টি.এম রিয়াদ, শেরপুর।

# 'পারমাণবিক বোমা' বিষয়ে ফিচার প্রকাশ কর হবে সত্যিই

## দৈনন্দিন বিজ্ঞান

যেদিন প্রথম সায়ের্স ওয়ার্ল্ড দেখেছি, সেদিন থেকেই পত্রিকাটি আমার হৃদয়ের সাথে মিশে গিয়েছে। আমার একটি জিজ্ঞাসা, সায়ের্স ওয়ার্ল্ড কি 'দৈনন্দিন বিজ্ঞান' সম্বন্ধে কোনো বিভাগ চালু করা যায় কিনা। প্রতিদিন বিজ্ঞানের যেসব বস্তু আমরা ব্যবহার করে থাকি তার ব্যবহার পদ্ধতি এবং সেটি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান যদি আমাদের দেওয়া হতো তবে আমরা উপকৃত হতাম। ইতিপূর্বে জানার আছে অনেক কিছু এমন শিরোনামে একটা বিভাগ ছিল, সেটা হারিয়ে গেল কেন? তাছাড়া পাঠক জিজ্ঞাসা নামেও কোনো বিভাগ এখন পর্যন্ত চালু হয়নি। এতগুলো সমস্যার সমাধান কি সায়ের্স ওয়ার্ল্ড দিতে পারবে?

শিয়োর আহমদ, খুচনীচড়া, বড়ুনা।

# আপনার প্রস্তাবিত বিভাগটি বিবেচনামূলক থাকলো।

## কিছু কথা

সায়ের্স ওয়ার্ল্ড-এর সাফল্যকামী বলে আমি একটি কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে 'বিজ্ঞান প্রজ্ঞান' নামে যে বিভাগটি চালু আছে তার গুরুত্ব কতখানি, এ বিভাগের পরিবেত অথবা বিভাগটিকে সংক্ষেপ করে 'গণিত নিয়ে খেলা' 'একটুখানি গণিত' বা 'গণিত আরো গণিত' শিরোনামে গণিতের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা, গণিতবিদ পরিচিতি বা গণিতের কুইজ দিলে খুবই ভাল হয়। এতে বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা হিসেবে এর মান যথেষ্ট বাড়বে বলে আমি মনে করি।

মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন শাকিল

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

# গণিত বিভাগ অবশ্যই আসতে পারে, তবে বিজ্ঞান প্রজ্ঞান বাদ দিয়ে নয়। কেননা বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব গঠনের আহ্বান ও উদ্যোগে সায়ের্স ওয়ার্ল্ড প্রকাশিত হচ্ছে। তিন হাজার সদস্যের বিজ্ঞান প্রজ্ঞান পরিবারের গুরুত্ব হালকা করে দেখার অবকাশ নেই।

## DNA সম্পর্কে জানতে চাই



'সায়ের্স ওয়ার্ল্ড' বর্ষ ৪, জুলাই-২০০৫ সংখ্যাটি পড়লাম। প্রচ্ছদকাহিনী 'মানব প্রজাতির অস্তিত্বের নিকৃতি অপরিমেয়' ভালো লাগলো। তবে আরও ছবি সংযোজন

করলে ভালো হতো। একস্থানে লেখা হয়েছে- 'মানুষের ভাষায় প্রকাশ করলে তা জায়গা নেবে একশ মোটা খণ্ডের গ্রন্থে। DNA-তে এতো তথ্য তার ছিটে ফোঁটাও জানি না। তাই 'সায়ের্স ওয়ার্ল্ড' সম্পাদক বরাবর অনুরোধ DNA সম্পর্কে ধারাবাহিক তথ্যাবলী প্রকাশ করুন।

রতন বসাক, সন্নজ, টাঙ্গাইল-১৯০০

# আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো।



## মানুষ ও শিম্পাঞ্জির ডিএনএ একই রকম

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের একদল বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, মানুষ ও শিম্পাঞ্জির ৯৬ শতাংশ ডিএনএ একই রকম। একটি শিম্পাঞ্জির পূর্ণ জিনোমচক্র পর্যবেক্ষণ করে এ তথ্য পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মানুষের বিবর্তন নিয়ে গবেষণায় এ আবিষ্কার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। গবেষণা দলের এক সদস্য জানান, বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে আমাদের খুব কাছাকাছি অবস্থান করা শিম্পাঞ্জি আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, আমরা সবচেয়ে মৌলিক একটি বিষয়ের উত্তর কিন্তু এখনো জানতে পারিনি। আর তা হচ্ছে, কে আমাদের মানুষ হিসেবে তৈরি করল? কিন্তু জেনোমিকের ক্ষেত্রে এ পার্থক্য নাটকীয়ভাবে জীববিদ্যার প্রধান পার্থক্যগুলো কমিয়ে আনে। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টা গবেষণা সেন্টারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৪ বছরের পুরুষ শিম্পাঞ্জি ক্রিস্ট মারা যায়। মারা গেলেও তার পূর্ণ জেনেটিক গঠন বিশ্ব ডাটাবেজে চতুর্থ স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে বেঁচে রয়েছে। আগের তিন স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে মানুষ, ইঁদুর ও বানর। শিম্পাঞ্জি জাতের সবচেয়ে বড় প্রাণী পানট্রোপ্লোডিটিস ও মানুষের মধ্যে যে গভীর আত্মীয়তা রয়েছে— এ গবেষণায় তাও প্রমাণিত হয়েছে।

■ সূত্র : ইন্টারনেট।

## রোবোটিক্সে নতুনত্ব

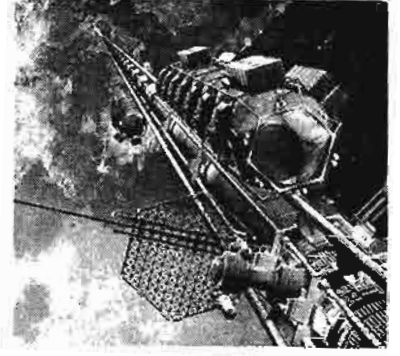
সম্প্রতি রোবোটিক্সের এক গবেষণায় জাপানের গবেষকরা হিউমেনয়েড বা মানব সদৃশ রোবটের উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। গবেষণায় তারা নতুন ধরনের একটি হিউমেনয়েড রোবট উদ্ভাবন করেছেন, যেটি পতনের পর খুব দ্রুত আবার দাঁড়াতে পারে।

রোবটটির নাম ডেনিল (R Dancel), নামটি নেয়া হয়েছে বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক আইজাক আজিমভের রচনা থেকে। আজিমভ তার অনেক বইয়ে এ নামের একটি রোবট চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এটি পা দিয়ে লাখি মারতে পারে এবং সেই সঙ্গে উপড় বা চিং যে কোনো অবস্থান থেকে দ্রুত পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারে। এসবের জন্য এ ৬০ কেজি ওজনের রোবটে ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থা। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে রোবটটির উদ্ভাবক টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাক্স লাসেরিলা জানান, 'পূর্বনির্ধারিত কোনো ব্যবস্থা দিয়ে সারাক্ষণ রোবটটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। রোবোটিক্সের নিয়ম অনুসরণ করে রোবটটি নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

হিউমেনয়েড রোবটগুলো মানুষের বিবর্তনের মতোই উত্তরোত্তর নিজেকে বিকশিত করতে পারে। এক্ষেত্রে



শক্তিশালী সেলস ব্যবস্থা অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ডেনিলে বেশ উন্নতমানের জটিল ও সূক্ষ্ম সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে জায়রোস্কোপ, এক্সিলেরোমিটারসহ আরো অত্যাধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি। বর্তমানে লাসেরিলা ও তার সহকর্মীরা লাফ, হাঁটা, হাত দোলানো, হাত মুঠো করা ইত্যাদি মানবসদৃশ ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছেন।



## ভাবম্যতের স্পেস এলিভেটর

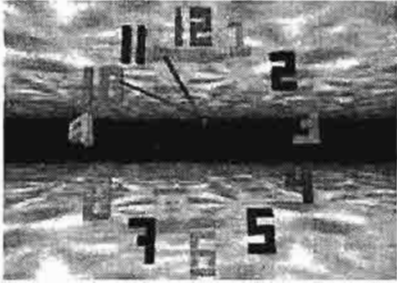
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন বা আইএসএস নিয়ে আমাদের বিশ্বয়ের সীমা নেই। শূন্যে অবস্থিত এ স্টেশন ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৭৫ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত। কিন্তু এরই মধ্যে আরেকটি ধারণা আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ধারণাটির নাম স্পেস এলিভেটর। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন আগামী কয়েক দশকে এ ধরনের এলিভেটর নির্মাণ সম্ভব। ইমেজের এ স্পেস এলিভেটরে রয়েছে ৬টি ধাপ। ওপরের ৬ নং লেভেল হচ্ছে আবাসিক এলাকা। নাম বিখ্যাত বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক আর্থার সি ক্লার্ক শপিং ডিস্ট্রিক্ট। ভূপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩৫,৭৯১ কিমি। পরের লেভেল সোলার পাওয়ার অর্থরিটি। এ লেভেলে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে। ৪ নং লেভেল স্যাটেলাইট ডকিং স্টেশন। নিচের লেভেলটি মার্স ট্রান্সফার পয়েন্ট। এখান থেকেই অন্য এলিভেটরে যাওয়া যাবে লাল গ্রহ মঙ্গলে। উচ্চতা ৩৪ হাজার কিমি। ২ নং লেভেল ভ্যান অ্যালেন হোটেল। আর সর্বশেষ লেভেলটি ডিজনি স্পেস স্টেশন, যেটা আগে ছিল আইএসএস। আর 'এল' চিহ্নিত বাটনটি লবি বা পৃথিবীর পৃষ্ঠ আর 'বি' বাটন হচ্ছে বেজমেন্ট।

## আসছে 'হারি পটার আইপড'

শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, নবীন-প্রবীণ সবার কাছেই হারি পটারের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। একের পর এক সিরিজের অপেক্ষায় থাকে হারি পটারের পাঠকরা। হারি পটারের জুরে আক্রান্ত সারা বিশ্বের বিনোদনপ্রিয় মানুষ। এমনকি হলিউড বক্স হাউসেও হারি পটারকে নিয়ে নির্মিত যে কোনো ছবিই প্রথম সপ্তাহেই ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন করে। গোটা বিশ্বের পাঠক এবং দর্শকদের মাতিয়ে রাখতে হারি পটারের জুড়ি মেলা ভার। সম্প্রতি অ্যাপেল কোম্পানি হারি পটারের এ জনপ্রিয়তাকে বাণিজ্যিক কাজে লাগাতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। হারি পটারের নামে অ্যাপেল প্রকাশ করতে যাচ্ছে 'হারি পটার আইপড'। শুধু আইপড নয় হারি পটারের এ যাবৎকালের ছয়টি প্রকাশনাকে অনলাইনের মাধ্যমে ডাউনলোডের সুবিধা দেবে অ্যাপেল। এছাড়াও হারি পটারের অডিও-ভিডিওসহ যে কোনো ধরনের প্রকাশনার জন্য অ্যাপেল প্রকাশ করতে যাচ্ছে হারি পটার বক্স সেট। এ বক্সে ডিজিটাল বুকলিট ছাড়াও থাকবে হারি পটার গল্পের লেখিকা জে. কে. রোলিং-এর ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত। আইপডে বহনযোগ্য হবে এমন সব অডিও-ভিডিও ফরম্যাটকে কাজে লাগিয়ে অ্যাপেল নতুনভাবে প্রকাশ করবে 'দি কমপ্লিট হারি পটার' নামের একটি অডিও বক্স। এছাড়া আইপডটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ২০ গিগাবাইটের রঙিন ডিসপ্লে। আইপডটির বিভিন্ন স্ক্রিনে দেখা যাবে হারি পটার সফটওয়্যার সব ধরনের মুভি ক্লিপসের দারুণ সব ইফেক্ট। আইপডটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য [www.apple.com/itunes/harrypotter](http://www.apple.com/itunes/harrypotter)— এ ঠিকানায় ঘুরে আসতে পারেন। কোনো কাহিনীকে জীবন্ত করে ব্যবসায়িক কাজে লাগানোর এ পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী আলোচনার ঝড় তুলেছে। দেখা যাক প্রতিযোগিতায় নতুন আর কোন কোন অতিথি তাদের নামের সাথে হারি পটারকে কাজে লাগায়।







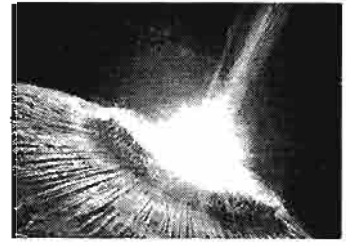
## হাতঘড়িতেই সবকিছু!

ইলেকট্রনিক্সের এ জন্মজন্মট সময়ে হাতঘড়ি আর শুধুই হাতঘড়ি নেই, বরং হাতের কজিতে বাঁধা ছোট ঘড়ি এখন অনেকগুলো আধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি মাল্টিডিভাইস ইলেকট্রনিক যন্ত্রে রূপ নিয়েছে। শুধু হাতঘড়ির মধ্যেই এখন পাওয়া যাচ্ছে পিডিএ, এমপি থ্রি প্রেয়ার, ৫১২ মেগাবাইটের ডাটা ব্যাংক, এমনকি টেলিভিশন আর মোবাইল ফোনের মতো আধুনিক সব প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা। এরকম বেশ কয়েকটি কোম্পানির ঘড়িই এখন বাজারে।

টেম্পাসের ফসিল ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি সম্প্রতি এরকম একটি ঘড়ি বাজারে ছেড়েছে, যার মূল্য ২৫০ মার্কিন ডলার। এর ১.৪ ইঞ্চির ১৬০ x ১৬০ পিক্সেল রেজুলেশনের এলসিডি স্ক্রিন অধিকাংশ বড় আকারের পিডিএ'র রেজুলেশনের প্রায় সমান। ৮ মেগাবাইট র‍্যাম আর ডাটা আদান-প্রদান ও চার্জ দেয়ার জন্য দুটি ইউএসবি পোর্টবিশিষ্ট বেশ স্টাইলিশ আর স্লিম এ ঘড়িটিতে ক্যালেন্ডার, নোটবুক, অ্যান্ড্রোসবুকসহ যাবতীয় সব সুবিধাই বিদ্যমান। এর ৫১২ মেগাবাইটের মেমোরি মোবাইল মেমোরির বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তবে এ ঘড়ি কাম পিডিএটির একটি সমস্যাও আছে; তা হলো, এর ব্যাটারির চার্জ সবসময় ন্যূনতম পরিমাণ হলেও থাকা চাই। কারণ এর চার্জ থাকে চার দিনের মতো, আর চার্জ পুরোপুরি ফুরিয়ে গেলে যেমরিতে থাকা সব তথ্যই সম্পূর্ণ

মুছে যায়। মিউজিক ভক্তদের জন্য চমৎকার আরেকটি ঘড়ি তৈরি করেছে চীনের জনিত্স ইলেকট্রনিক্স। ১২৮ মেগাবাইট থেকে ১ গিগাবাইট পর্যন্ত ফ্ল্যাশ মেমোরিযুক্ত এ ঘড়িগুলোর দাম ১৩০ থেকে ২৮০ মার্কিন ডলারের মধ্যে। তারিখ ও এলার্ম ফাংশনহীন এনালগ এ ঘড়িটির কোনো ডিজিটাল ডিসপ্লে না থাকলেও রয়েছে চমৎকার একটি ডিজিটাল মিউজিক প্রেয়ার। পিসি থেকে গান কপি করার জন্য ঘড়ির ফিতার নিচে লুকানো অবস্থায় আছে একটি ইউএসবি পোর্ট আর গান শোনার জন্য আছে দুর্দান্তমানের ছোট একজোড়া এয়ারবাস। ইচ্ছে করলে একে ইউএসবি ড্রাইভ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, আবার ডায়াল রেকর্ডিংয়ের কাজও অন্যায়সে চলে।

আমেরিকার পাওয়ার হুইজ টেকনোলজি গ্রুপের তৈরি আরেকটি মাল্টিডিভাইস ঘড়ি 'মিগো'। ৫১২ মেগাবাইট মেমোরি সম্বলিত এ মিগো কম্পিউটার সদৃশ বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যদের থেকে আলাদা। এ ঘড়ির ডিজিটাল স্ক্রিন একেবারে পিসির ডেস্কটপের মতোই, আর পিসির সাথে যুক্ত হবার সাথে সাথেই এতে ই-মেইলসহ কম্পিউটারের বিভিন্ন ফাইল কপি করে নেয়া যায় সহজেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটিতে কম্পিউটারের মতোই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। তবে এটা উইন্ডোজ সিস্টেমের সাথেই ব্যবহারযোগ্য। আরো কয়েকটি কোম্পানি এরকম বেশ কয়েকটি মাল্টিডিভাইস ঘড়ি তৈরি করে ইতোমধ্যেই বাজারে ছেড়েছে। জাপানের এসএইচজে গত বছর একটি রঙিন ঘড়ি কাম টিবি বাজারে ছেড়েছে। আবার নিউইয়র্কের ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি এলএলসি তৈরি করেছে এমন এক ঘড়ি, যেটা একই সাথে মোবাইল নেটেরও কাজ করে। আর রেডিও এবং ক্যামেরা সংবলিত ঘড়িও বাজারে চলে এসেছে ইতোমধ্যেই। হরতো অর্ডারেই এ হাতঘড়িই হয়ে উঠবে ডাটা ব্যাংক, টেলিভিশন, রেডিও, মিউজিক প্রেয়ার, এমনকি পার্সোনাল কম্পিউটারের বিকল্প।



## টেম্পল-১ সংঘর্ষের ফলাফল নিয়ে বিজ্ঞানীরা সংশয়ে

জুলাইয়ের ৪ তারিখে ধুমকেতু টেম্পল-১-এর গায়ে আঘাত হানে মহাকাশযান ডিপ ইম্প্যাক্ট থেকে অবমুক্ত অনুসন্ধানী যান 'ইম্প্যাক্টর'। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত হতে পারেননি যে, সংঘর্ষের ফলে ধুমকেতু পৃষ্ঠে ঠিক কত বড় বা বিস্তৃত গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সংঘর্ষের পর মূল মহাকাশযান ডিপ ইম্প্যাক্ট থেকে তোলা ছবিগুলো নিয়ে এক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ধুমকেতুর গায়ে অনুসন্ধানী যান ইম্প্যাক্টরের আঘাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত বস্তুর প্রায় ৯০০ ফুট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণা করা হয়, আঘাতের ফলে সৃষ্ট গর্তের বিস্তার ৯০০ ফুটের কম হবে। অবশ্য প্রকৃত আকার নিশ্চিত করতে আরো গবেষণা প্রয়োজন। জুলাই ৪-এর ডিপ ইম্প্যাক্ট অভিযানের ওপর ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন ইন্টারনেটে বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন, সংঘর্ষের ফলে ধুমকেতু থেকে উৎক্ষিপ্ত বস্তুটি 'অনিম' ও 'সন্দামটা' পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং তা পৃথিবীর মতো জটিল কোনো পদার্থ নয়।

■ সূত্র : ইন্টারনেট

## হাঁপানির ঝুঁকি এড়াতে হলে



হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘমেয়াদি এক গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, অতিরিক্ত ওজনধারী নারীদের মধ্যে হাঁপানি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তারা দেখেছেন যে, অতিরিক্ত ওজনের কারণে দেহে হরমোনের তারতম্য ঘটে যা হাঁপানি হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং হাঁপানির ঝুঁকি এড়াতে হলে

অবশ্যই নারীদেরকে দৈনিক ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শরীরে একবার মেদ জমে গেলে তা কমানো অনেক কষ্টসাধ্য। তাই মোটা হয়ে হাফা হওয়ার চেষ্টা না করে দেহে যাতে অতিরিক্ত চর্বি জমতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার জন্য দরকার সম্পূর্ণ

চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা, টাটকা শাকসবজি, ফলমূল বেশি খাওয়া, নিয়মিত হাঁটা চলা, ব্যায়াম করা। যদি কারো ওজন ইতোমধ্যে বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার ওজন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বাসার কাজকর্ম নিজে করা। শরীর থেকে ঘাম বের হয় এমন দৈনিক পরিশ্রম করা, অধিক ক্যালোরিযুক্ত খাবার পরিহার করে নিরামিষ, টক জাতীয় ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করা। দৈনিক ছয় থেকে আট ঘণ্টার বেশি বিছানায় না শুয়ে থাকা।

কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে আঁশ জাতীয় খাবার কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে অত্যন্ত কার্যকরী। সাধারণত উদ্ভিজ্জাত খাদ্য যেমন- ফলমূল, শাকসবজি, ইসবগুল, শস্যাদান ইত্যাদি আঁশসমৃদ্ধ। এ আঁশ জাতীয় খাবার পরিপাকতন্ত্রে গিয়ে স্পঞ্জের মতো কাজ করে। এরা চর্বি, পানি ও অন্যান্য খাদ্যাংশগুলোকে শোষণ করে। কোনো কোনো খাদ্যে আঁশ বেশি থাকে সেগুলো আমাদের জানা দরকার। শিম, মটরগুটি, বরবটি, সয়াবিন, টেকি ছাটা চাল, হরেক রকমের ডাল, টাটকা ফলমূল ইত্যাদিতে আঁশ বেশি পরিমাণে থাকে। সবজি এবং ফলমূলের খোসায় পেকটিন ও আঁশের ঘনত্ব বেশি থাকে।



## ভূত ভবিষ্যতের সময়যান

এস. এম. শামসুজ্জোহা

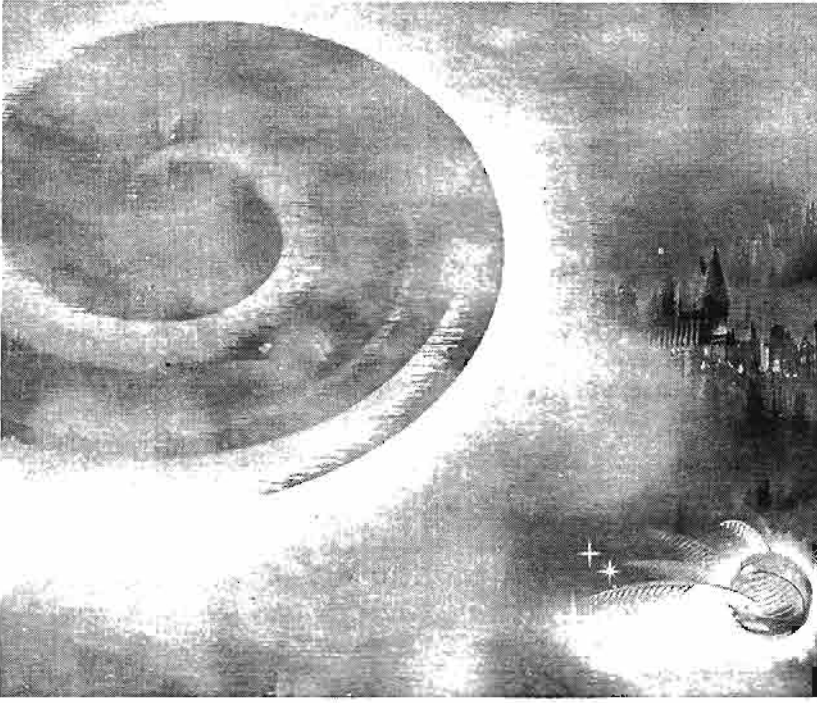
সময় সম্পর্কে আমাদের মূল ধারণা এসেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব থেকে। আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখান যে, দুটি ঘটনার মধ্যে যে বিরতি পর্যবেক্ষণ করা হয় সেটি পর্যবেক্ষকের গতির ওপর নির্ভরশীল। যদি দুজন পর্যবেক্ষক ভিন্নভাবে গতিশীল থাকেন, তাহলে দুটি ঘটনার মধ্যে বিদ্যমান বিরতিকে তারা দু রকম পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ঘটনাটিকে অনেক সময় 'টুইন প্যারাডক্স' দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে।

স্বপ্ন, চেষ্টা ও সাফল্য এ নিয়েই মানুষের জীবন। তাই কোনো স্বপ্নই হেলাফেলার নয়। সব স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মানুষ চেষ্টা করে আগ্রাণ। ফলে সফলও হয়। বিজ্ঞানের জগতে এর দৃষ্টান্ত অহরহই দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি মানুষের একটি স্বপ্ন 'টাইম মেশিন' বা 'সময়যান'। তাই টাইম মেশিন নিয়ে মানুষের ধ্যান-ধারণার শেষ নেই। ১৮৯৫ সালে এইচ. জি. ওয়েলসের 'টাইম মেশিন' প্রকাশিত হওয়ার পর ১০০ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু সময় পরিভ্রমণ নিয়ে উদ্বেজনা বোধ হয় একটুও কমেনি। গত কয়েক দশক ধরে সময় পরিভ্রমণকে খুব একটা সম্মানজনক দৃষ্টিতে দেখা হতো না। কিন্তু কয়েক বছর ধরে তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের কাছে বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও মোটামুটিভাবে এ আকর্ষণটা অবসর সময় কাটানোর মতো ব্যাপার হলেও এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকও রয়েছে। কার্যকারণ সম্পর্কে বলে বিজ্ঞানের

একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে হলেও যদি সময় পরিভ্রমণ সম্ভব হয় তাহলে কার্যকারণ সম্পর্ক আর প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে থাকবে না। সময় সম্পর্ক আমাদের মূল ধারণা এসেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব থেকে। এর আগে সময়কে বিমূর্ত এবং সর্বজনীন একটি বিষয় বলে ধরে নেয়া হতো। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাই হোক না কেন সময় সবার জন্য একই রকম। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখান যে, দুটি ঘটনার মধ্যে যে বিরতি পর্যবেক্ষণ করা হয় সেটি পর্যবেক্ষকের গতির ওপর নির্ভরশীল। যদি দুজন পর্যবেক্ষক ভিন্নভাবে গতিশীল থাকেন, তাহলে দুটি ঘটনার মধ্যে বিদ্যমান বিরতিকে তারা দু রকম পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ঘটনাটিকে অনেক সময় 'টুইন প্যারাডক্স' দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। ধরা যাক, অ্যামি এবং জ্যামি যমজ ভাইবোন। অ্যামি রকেটে চেপে খুবই উচ্চ গতিতে কাছের কোনো তারা থেকে ঘুরে পৃথিবীতে এলো। সে সময়ে

জ্যামি ঘরেই থাকলো। অ্যামির কাছে পুরো ভ্রমণটি মনে হবে ধরা যাক ১ বছরের সমান। কিন্তু যখন সে মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করবে তখন দেখতে পাবে যে, পৃথিবীতে ১০ বছর পার হয়ে গেছে। তার চেয়ে তার ভাইয়ের বয়স তখন ৯ বছর বেশি। এ ঘটনায় সীমিত আকারের সময় পরিভ্রমণের নমুনা দেখা যায়। এখানে অ্যামি পৃথিবীর ৯ বছর ভবিষ্যতে পৌঁছে যেতে সম্ভব হয়েছে। টাইম ডাইলেশন বা স্থির সময়ের ঘটনা তখনই ঘটে যখন দুজন পর্যবেক্ষক একে অপরের সাপেক্ষে গতিশীল থাকেন। সাধারণত জীবনে আমরা সময়ের ধীর হয়ে যাওয়ার ঘটনা তেমন একটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। কারণ এটি তখন দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে যখন গতি আলোরগতির কাছাকাছি হয়, এমনকি বিমানের গতিতেও সাধারণ একটি ভ্রমণের সময়ের ধীর হওয়ার পরিমাণ কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের বেশি হয় না। তারপরেও পারমাণবিক ঘড়িগুলো এতো বেশি নিখুঁত যে, তারা সময়ের ধীর হয়ে





ওয়ার্মহোল তত্ত্বকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সমর্থন করে। এখানে অভিকর্ষ শুধু সময়কেই নয়, স্থানকেও সঙ্কুচিত করছে। এটি অনেকটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা আর পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গের রাস্তার মতো। ওপরের রাস্তার চেয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেক কম সময়ে একই জায়গায় পৌঁছান সম্ভব।

যাওয়াটিও পরিমাপ করতে সক্ষম। আর তাই ভবিষ্যৎ সময়ে পরিভ্রমণ করা অনেকটা প্রমাণিত। সময় পরিভ্রমণের ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করতে হলে আমাদের সাধারণ জীবনের ঘটনাবলী বাদ দিয়ে উপ-পারমাণবিক কণা বা সাব-এটোমিক পার্টিকেলগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। ভ্রমণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের আলোরগতির কাছাকাছি গতি দান করা সম্ভব। এসব কণার কোনো কোনোটির নিজস্ব ঘড়িও রয়েছে। যেমন- মিউওন, মিউওনের অর্ধ-জীবন বা হাফ লাইফ আছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা গেছে যে, উচ্চ গতিসম্পন্ন মিউওনের অর্ধ-জীবন সাধারণ গতির মিউওনের তুলনায় দীর্ঘ হয়ে থাকে। কিছু মহাজাগতিক রশ্মিও সময় পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। এ কণিকাগুলো আলোরগতির এতো বেশি কাছাকাছি গতিসম্পন্ন যে, তাদের দৃষ্টিতে পুরো গ্যালাক্সি পার হতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। যদিও পৃথিবীর দৃষ্টিতে এদের সময় লাগে কয়েক হাজার বছর।

ভবিষ্যতে যাওয়া না হয় সম্ভব হলো কিন্তু অতীতে যাওয়ার কি হবে? ১৯৭৪ সালে তুলান ইউনিভার্সিটির ফ্রাঙ্ক জে টিপলার হিসাব করে দেখান যে, প্রচণ্ড ভরসম্পন্ন অসীম দৈর্ঘ্যের কোনো সিলিন্ডার যদি নিজ অক্ষের ওপর আলোরগতির কাছাকাছি গতিতে আবর্তন করতে থাকে তাহলে মহাকাশচারীদের পক্ষে তাদের অতীতে যাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রেও এর

কারণ হিসেবে বলা হয় যে, এই অতি ভরসম্পন্ন সিলিন্ডারটি তার চারপাশের আলোকে একটি চত্রেয় মধ্যে ধরে রাখবে। ১৯৯১ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির জে রিচার্ড গট ধারণা করেন যে, কসমিক স্ট্রিংয়ের পক্ষেও এ রকম একটা প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। (মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষকদের মতে কসমিক স্ট্রিং হচ্ছে এমন একটি কার্ভো, যেটি বিগ ব্যাংয়ের আদি পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে।)। তবে অশির দশকের মাঝামাঝিতে টাইম মেশিন নিয়ে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। নেটি হচ্ছে ওয়ার্মহোল তত্ত্ব। কল্পবিজ্ঞানে ওয়ার্মহোলকে অনেক সময় স্টারগেটও বলা হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে মহাকাশের বিশাল দূরত্বসম্পন্ন জায়গার মধ্যের শর্টকাট।

ওয়ার্মহোল তত্ত্বকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সমর্থন করে। এখানে অভিকর্ষ শুধু সময়কেই নয়, স্থানকেও সঙ্কুচিত করছে। এটি অনেকটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা আর পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গের রাস্তার মতো। ওপরের রাস্তার চেয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেক কম সময়ে একই জায়গায় পৌঁছান সম্ভব। ওয়ার্মহোলও ঠিক তেমনি। ১৮৯৫ সালে কন্সট্যান্ট নামে একটি উপন্যাসে কার্ল স্যাগান ওয়ার্মহোল তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এরপর ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির কিপ এস থর্ন এবং তার সহকর্মীরা প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের সহায়তায় ওয়ার্মহোলকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।

তাদের মতে ব্ল্যাকহোলের মতো ওয়ার্মহোলেরও অসম্ভব রকম অভিকর্ষ থাকবে। কিন্তু ব্ল্যাকহোল যেখানে কোনো কিছুই বের করতে পারে না, ওয়ার্মহোল সে রকম হবে না। বরং ওয়ার্মহোলে প্রবেশের এবং বের হওয়ার জন্য রাস্তা থাকবে। শিগগিরই থর্ন এবং তার সহকর্মীরা বুঝতে পারলেন যে, যদি স্থিতিশীল একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করা যায়, তাহলে সেটি টাইম মেশিনের মতো কাজ করবে।

কোনো মহাকাশচারী এর ভেতর দিয়ে গেলে শুধু যে মহাবিশ্বের অন্যত্র গিয়ে পৌঁছবে তাই নয়, সে অন্য একটি সময়েও গিয়ে পৌঁছবে। সেটি হতে পারে ভবিষ্যৎ অথবা অতীত। একটি ওয়ার্মহোলকে সময় পরিভ্রমণের উপযোগী করতে হলে সেটির এক মাথাকে নিউটন স্টারের পৃষ্ঠের কাছাকাছি টেনে রাখতে হবে। এতে করে নিউটন স্টারের অভিকর্ষ ওয়ার্মহোলের সেই মুখের কাছে সময়কে ধীর করে দেবে। আর এতে করে ওয়ার্মহোলের দু মুখের মধ্যে সময়ের তারতম্য ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠবে। এরপর যদি এই দু মাথাকে মহাকাশের দুবিধাজনক দু জায়গায় রাখা যায়, তাহলে এ দু মুখের মধ্যে সময়ের তারতম্য বিদ্যমান থাকবে।

ধরা যাক, দু মুখের মধ্যে পার্থক্য হলো ১০ বছর। এখন ওয়ার্মহোলের একমুখ দিয়ে লাফ দিয়ে মহাকাশচারীরা ১০ বছর ভবিষ্যতে চলে যেতে পারেন। তাহলে সেই অপর মুখ দিয়ে কেউ লাফ দিয়ে এ পার্শ্বের মুখ দিয়ে ১০ বছর অতীতে চলে আসতে পারবে। কিন্তু এভাবেও ওয়ার্মহোলটি প্রথম যখন তৈরি হয়, তার আগে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়। ওয়ার্মহোল টাইম মেশিন তৈরির প্রথম সমস্যা হচ্ছে প্রথমে ওয়ার্মহোল তৈরি করা। খুব ছোট মাত্রায় এ ধরনের ওয়ার্মহোল তৈরি করা সম্ভব।

তাত্ত্বিকভাবে পারমাণবিক কেন্দ্রের মতো ছোট মাত্রায় ওয়ার্মহোল তৈরি করা সম্ভব। আবার এ ওয়ার্মহোলকে শক্তি প্রদানের মাধ্যমে স্থিতিশীল করা সম্ভব। এরপর এটিকে প্রায় তখনমতো বাড়িয়ে ব্যবহারের আকারে নিয়ে আসা সম্ভব। তাই তাত্ত্বিকভাবে টাইম মেশিন সমস্যার সমাধান হলোও বেশ কিছু কাছাকাছি। কিন্তু তখন হবে যেহেতু এই নৈসর্গিক উপায়গুলো কেউ যদি নিজের অতীতে গিয়ে নিজের মাকে হত্যা করে তাহলে কী হবে? তখন তার জন্ম হওয়া সম্ভব কিভাবে? কিংবা কেউ যদি ভবিষ্যতে গিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জেনে বর্তমানে এসে সেটা সবাইকে জানিয়ে দেয় তাহলে সে জ্ঞানের উৎস কোথায়? এত সব প্রশ্ন আর কৌতূহল এখন বিজ্ঞানীদের ওপরেই বর্তায়। এখন বিজ্ঞানীরা এ সময়যান নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন ও চেষ্টা করছেন। হয়তো বেশি দূরে নেই সাফল্য। হয়তো আগামী শতাব্দীর সপ্তাচার্যের মধ্যে টাইম মেশিন অথবা সময়যানও একটি আদর্শ হিসেবে প্রতীয়মান হবে। সেই প্রতীক্ষায় দিন গুণছে মানবজাতি। সে পর্যন্ত সবাইকেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে- সময়যানের প্রতীক্ষায়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

# রোযায় স্বাস্থ্যসম্মত সেহরি ও ইফতার

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল



রমযান মাস মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র মাস। এ সময়ে সংযম ও সাধনের পাশাপাশি সুস্থ ব্যক্তির অনেককেই রোযা রাখেন। যারা অসুস্থ, তাদের অনেকেও আগ্রহ প্রকাশ করেন রোযা রাখার কিন্তু রোযা রাখা উচিত হবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারেন না। কেউ কেউ রোযা রাখার বিপক্ষে অজুহাত তৈরি করেন এই বলে যে, রোযা রাখলে এসিডিটি বেড়ে যাবে— দেখা দেবে পেপটিক আলসার। আবার অনেকে ওষুধ খেতে অসুবিধা হবে এমন কথাও বলে থাকেন। যারা অত্যধিক মোটা তারা স্লিম হওয়ার আশায় রোযা রাখতে উৎসুক হন। কিন্তু যারা রোগা তারা রোযা রাখার ব্যাপারে ততটা উৎসাহী না হয়ে হাজার ব্যাখ্যা দাঁড় করান। প্রকৃতপক্ষে রোযা নিয়ে মানুষের স্বাস্থ্যভাবনার শেষ নেই। রোযায় সেহরি, ইফতার ও শারীরিক সুস্থতা নিয়ে মানুষের মনে এ সময়ে থাকে অনেক জিজ্ঞাসা।

রোযায় সেহরি ও ইফতার কেমন হবে? অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে রমযানে যে খাদ্যাভ্যাস লক্ষ্য করা যায়, তা পুরোপুরি স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এ সময়ে খাবারের প্রধান পর্যায় দুটি— সেহরি ও ইফতার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের দেশে সেহরি ও ইফতারের অধিকাংশ খাবারই হচ্ছে উচ্চ চর্বিযুক্ত এবং তেলে ভাজা। সেহরি ও ইফতারের খাবার নির্বাচনে রোযাদারের বয়স ও শারীরিক অবস্থাকে বিবেচনা রাখা হয় না। কিন্তু এসব দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমে সেহরির প্রসঙ্গে আসা যাক। স্বাভাবিকভাবে যে কোনো ধরনের খাবারই

সেহরিতে খাওয়া যায়, তবে খেয়াল রাখতে হবে খাবারটা যেন সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। সেহরিতে অবশ্যই সাদা ভাত রাখবেন। তবে ভাতের সাথে রাখতে হবে উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার যেমন— মাছ, মাংস ও ডিম। খরচ কমাতে চাইলে ভাতের সাথে শুধু ডিম ও ডাল। ভাল উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলে এতে ক্ষতিকর চর্বি নেই। সেহরির খাবার তালিকায় যে কোনো একটি সবজি থাকা বাঞ্ছনীয়। পেঁপে, করলা, আলু, টম্যাটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম—এর কয়েকটি বা যে কোনো একটি রাখলে চলবে। পাকস্থলীতে উত্তেজনা ও অস্থি সৃষ্টি করে এমন কোনো খাবার খাওয়া উচিত নয়।

## ইফতার প্রসঙ্গ

ইফতার পর্বে উত্তেজক খাবার একেবারেই বর্জন করতে হবে। ইফতার শুরু করবেন শরবত দিয়ে। কৃত্রিম রঙ মেশানো যেসব শরবত পাওয়া যায়, সেগুলো অবশ্যই পরিহার করবেন। ইফতারে ফলের রস বেশ উপকারী। যে কোনো একটি ফল খাবেন ইফতারে। ফলে থাকে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ, যা আপনাকে স্বাস্থ্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে। বুট, ছোলা ও মুড়ি খেতে পারেন এ সময়ে। দই, চিড়া ও কলা খেলে ভালো। তবে প্রচলিত বেহুনি ও পেঁয়াজ সর্বদা পরিহার করবেন। তেলে ভাজা এসব খাবার স্বাস্থ্যবিপর্যয় ঘটতে পারে। তাই ইফতারে বেহুনি ও বেহুনি ফল রাখা ভালো। সারাদিন না খেয়ে থাকার ফলে শরীরে গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দেবে। বেহুনি সেই ঘাটতি পূরণে সহায় করে। সেহরি এবং ইফতারে প্রচুর পানি পান করুন। আপনি আপনার শরীরের কোষগুলো সজীব রাখবেন।

## পেপটিক আলসারের রোগী কী রোযা রাখতে পারবেন?

হ্যাঁ, পারবেন। এ সময়ে খাবার দাবারে নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টি হয় বলে রোযায় স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। তবে সেহরি ও ইফতারে তাদেরকে বাছাই করা খাবার খেতে হবে। তৈলাক্ত খাবার পরিহার করে সহজপাচ্য খাবার খেলে এসিড নিঃসরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং স্বাস্থ্যগত কোনো অসুবিধা হবে না।

## রোযা রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে— এ কথা কি ঠিক?

কিছুটা ঠিক বটে— বিদেশ করে যারা রোযার বাইরে অসংযত জীবনযাপন করেছেন, রোযার এক ধরনের শৃঙ্খলাবোধ কাজ করে। সময়মতো আহার গ্রহণ, বিশ্রাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ঘুমপান ও মধ্যপান বর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রকরাভারে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে।

## ডায়াবেটিসের রোগী কি রোযা রাখতে পারবেন?

এক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রোযা রাখতে হবে। যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন, রোযা তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী এদের রোযা না রাখাই

ভালো। কিন্তু যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন না তারা রোযা রাখতে পারেন। তবে রোযা রাখার সময় অনেকেই হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে রোযা রাখার আগে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে আপনার চিকিৎসাপত্র, খাবার ও ব্যায়ামের ব্যাপারে ঠিক করে নেবেন। এ সময়ে দৈনন্দিন কাজ সীমিত করে করতে হবে।

## রোযা রাখলে হৃদরোগীদের কি কোনো অসুবিধা হবে?

সাধারণত অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া এ সময়ে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ রাখার একটা সুযোগ তৈরি হয় বলে তাদের ব্লকড কোলেস্টেরলের মাত্রাও ঠিক থাকে।

## রোযায় পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কি থাকে?

হ্যাঁ, থাকে— যদি আপনি সেহরি ও ইফতারের পর্যাপ্ত পানি না পান করেন। সেহরি ও ইফতারে পর্যাপ্ত পানির সাথে শরবতবিজ ও ফলমূল খাবেন। তাহলে পানিশূন্যতায় পীড়াপীড়ি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও রেহাই পাবেন।

## হাঁচি ও শ্বস্বাস্থ্য— রোযার সময়ে তারা কী করবেন?

রোযার সময়ে ওষুধ কোনো সমস্যা নয়। চিকিৎসকের বলে ওষুধের মাত্রা ঠিক করে নিলেই হলো। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে রোযা রাখার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হবে। অন্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধের মাত্রা ঠিক করে নিলে রোযা রাখতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হবে না।

## নির্দিষ্ট শ্রেণি মধ্যব্যাধি করলে ইফতারের সাথে সাধাই কি বাধ্যনামক ওষুধ খাওয়া যাবে?

বিভিন্ন হাসপাতালে দেখা গেছে, রোযার সময় ইফতারের পরপরই অধিকাংশ রোগী ভর্তি হন তীব্র ব্যথা নিয়ে। অনেকের অস্ত্র ফুটো হয়ে যায় এবং জরুরি অপারেশনের প্রয়োজন হয়। ব্যথানাশক ওষুধ খাবার কারণে পেটে তীব্র ব্যথা এবং অস্ত্র ফুটো হয়ে যাওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। মূলত মাথাব্যথা করলে ইফতারের সাথে সাথেই ব্যথানাশক ওষুধ যেমন এনপিআই বা ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম খাওয়া উচিত নয়। কিছু খেয়ে তারপর এসব ওষুধ খেতে হবে। যাদের পেপটিক আলসারের ইতিহাস আছে, তারা এন্টাসিড ও রেট্রিটিউন খেয়ে এসব ওষুধ খাবেন। নতুবা মাথাব্যথা সারাতে গিয়ে আপনাকে পড়তে হবে তীব্র সমস্যার মুখে।

## অনেকে রোযার দিনে সারাদিন ঘুমান— এটা কি স্বাস্থ্যসম্মত?

মোটাই না। এভাবে ঘুমাতে আপনার শরীরের কোষগুলো অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে দারুণ ক্লান্তি অনুভব করবেন আপনি। বরং ইফতারের পরে বিশ্রাম নেয়াই স্বাস্থ্যসম্মত। একজন সুস্থ মানুষের জন্য দৈনিক ৫-৭ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। এ ঘুমটার জন্য আপনি ইফতার ও সেহরির পরের সময়টুকু কাজে লাগাতে পারেন। তাছাড়া দিনের বেলা ঘুমাতে রাতে নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়— সেই সাথে জড়ো হয় স্বাস্থ্যগত আরো সমস্যা।



## টি-৯ প্রযুক্তি

মোবাইল  
অভিধান

এইচ রেজা



Bangladesh শব্দটি লিখতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রথমে পর পর দু'বার ২, একবার ৬, একবার ৪, একবার ৫, একবার ২, দু'বার ৩, একবার ৭ এবং একবার ৪ টিপলেই Bangladesh শব্দটি তৈরি হয়ে যাবে।

প্রক্রিয়াটি দেখতে নিম্নরূপ :

ধাপ-১ : ২ কী চাপলে : A

ধাপ-২ : ২ কী চাপলে : Cc

ধাপ-৩ : ৬ কী চাপলে : Can

ধাপ-৪ : ৪ কী চাপলে : Bang

ধাপ-৫ : ৫ কী চাপলে : Bangk

ধাপ-৬ : ২ কী চাপলে : Bangla

ধাপ-৭ : ৩ কী চাপলে : Banglad

ধাপ-৮ : ৩ কী চাপলে : Banglade

ধাপ-৯ : ৭ কী চাপলে : Bangladesh

ধাপ-১০ : ৪ কী চাপলে : Bangladesh

পুরে প্রতিটি লেখার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে আপনার কাছে শব্দগুলোর কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রে একটি অভ্যন্তরীণ লাইন দেখতে পাবেন। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। কেননা এটি স্পেল চেক করেছে। কোনো ক্ষেত্রে ভুল হলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি আপনাকে Spell চেক করতে বলবে। যারা মাল্টি ট্যাপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন এটি হয়ত তাদের মাঝে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তবে কিছুটা চেষ্টায় এটি আর সমস্যা বলে মনে হবে না। এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে আপনার কী প্যাডের ক্ষয় কম হবে। দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। ব্যাকল হিটের ব্যবহার এবং ব্যাটমির খরচ দুই-ই সাশ্রয় হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যটি না পেলে :

এ পদ্ধতিতে আপনি হয়ত সবগুলো শব্দ পাবেন না। যেমন- Bangladesh লিখতে পারলেও Dhaka লিখতে পারবেন না। এটি লিখতে গেলে প্রদর্শিত হবে Egalc. সেক্ষেত্রে চিন্তার কিছু নেই। এক্ষেত্রে টি-৯ পদ্ধতি একটু পরিবর্তন করে সাধারণ পদ্ধতি এনে প্রয়োজন অনুযায়ী লিখে আবার তা পরিবর্তন করুন। এটি সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

এছাড়া প্রয়োজনবোধে শব্দটি ডিকশনারিতে সন্ধান করে রাখুন। ফলে পরবর্তীতে শব্দটি নিয়ে আর বামেলা হবে না। এজন্য মোবাইলে খুঁজলে স্পেল, ইনসার্ট ওয়ার্ড কিংবা অ্যাড ওয়ার্ড বিভিন্ন ফাংশন পেতে পারেন। এছাড়াও মোবাইলের Next বাটনে ক্লিক করে দেখতে পারেন কাঙ্ক্ষিত শব্দটি পাওয়া যায় কিনা। কেননা, অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত শব্দটি হওয়ার কারণে লিখিত শব্দটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো শব্দ থাকার কারণে প্রথম শব্দটি পর্দায় প্রদর্শিত হতে পারে।

এ পদ্ধতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে [www.t9.com](http://www.t9.com) সাইটে ভিজিট করুন।

যুগের উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে মোবাইল ব্যবহারের সংখ্যা বাড়ছে। মোবাইলের বিভিন্ন ব্যবহারের মাঝে এসএমএস বা শর্ট ম্যাসেজ সার্ভিস অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। সারা বিশ্বে এসএমএস সার্ভিসের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। যদিও এসএমএস করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবুও অনেকে কল করার চেয়ে এসএমএস অনেকটা সাশ্রয়ী বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে আরেকটি সুবিধা হলো আপনি হয়ত কাউকে ফোন করে মোবাইল বন্ধ হওয়ায় কথা বলতে পারেননি। সেক্ষেত্রে তাকে ম্যাসেজ দিয়ে দিন। যখন তিনি ফোনটি অন করবেন সাথে সাথে ম্যাসেজটি পেয়ে যাবেন। এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশের একটেল এবং বাংলালিঙ্ক মোবাইল ফোনে ইন্টারন্যাশনাল এসএমএস পাঠানো যায়, যা বেশ সাশ্রয়ী। আর মোবাইল দিয়ে ই-মেইল দেখানোও কিন্তু ম্যাসেজের ব্যবহার রয়েছে। এ প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে আরো সহজ ও সুচারু করে তৈরি সম্প্রতি টি-৯ ব্যবহার শুরু হয়েছে।

## টি-৯ কী?

সাধারণভাবে আমরা মোবাইলে ম্যাসেজ লেখার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি (মাল্টি ট্যাপ) অনুসরণ করে থাকি টি-৯ (T-9) সেটা থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। টি-৯ মূলত মোবাইলে দ্রুত বার্তা লেখার জন্য বিশেষ প্রকৃতির সফটওয়্যার। এর পূর্ণরূপ হলো 'Text of 9 keys' অর্থাৎ এটি ৯টি বাটন দিয়ে লেখার বিশেষ একটি পদ্ধতি। ২ থেকে ৭ পর্যন্ত (A থেকে Z) সর্বমোট ২৬টি অক্ষর রয়েছে। টি-৯-কে মোবাইল ফোনের অভিধান বা ডিকশনারি বলা যেতে পারে। ২ থেকে ৭ পর্যন্ত মোট আটটি বাটনের বাইরে রয়েছে ০ কিংবা 1, এখানে আনুষঙ্গিক আরো কিছু চিহ্ন বা ক্যারেকটার রয়েছে। সবগুলোকে একত্রে টি-৯ বলা হয়। এ নয়টি বাটনের মধ্যে শব্দগুলোকে একত্রিকরণ করা হয়েছে। আমরা

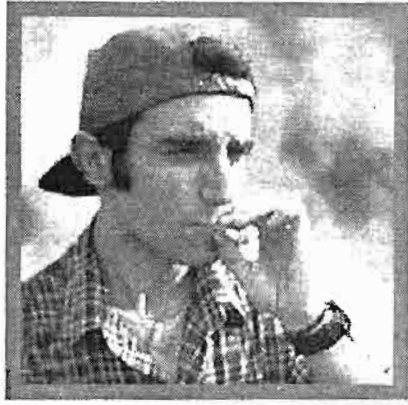
শব্দগুলোকে বড় আকারের শব্দকে মোবাইলে লিখতে গেলে বাটন বারবার টিপতে হয়। কিন্তু টি-৯ পদ্ধতিতে তা একবার চাপ দিলেই প্রক্রিয়া শেষে কাঙ্ক্ষিত শব্দটি পাওয়া যাবে।

## টি-৯ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা :

মূলত ছোট আকৃতির ডিভাইসগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই টি-৯ পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে। স্থান সঙ্কটের কারণে এ জাতীয় ডিভাইসে সবগুলো বাটন একত্রিত করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা এ পদ্ধতির মাধ্যমে সহজভাবে এবং অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজ লেখা সম্ভব। কেননা এতে আগে থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ওয়ার্ড বা শব্দ সংযোগ করা হয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাসহ ১০টি-এর অধিক ভাষায় টি-৯ ডিকশনারি রয়েছে অর্থাৎ টি-৯ এখন বিশ্বের প্রায় ৪০টি ভাষায় কাজ করতে পারে।

## টি-৯ কিভাবে ব্যবহার করবেন?

টি-৯ ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। পদ্ধতিটি আপনার হাতের মোবাইলেই সংযোজিত রয়েছে। বিশ্বের প্রায় সব মোবাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আরো অনেক আগে থেকেই মোবাইল সেটগুলোতে এ পদ্ধতি সংযোজিত করেছে। এটি আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত। তবে 'সেনডো' নামের একটি সেটে মেনুগুলো বাংলায় ছিল বলে শোনা গেছে। এটি অবশ্য তেমন প্রচলিত নয়। মোবাইল সেটগুলোতে অক্ষর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। যেমন- abc, 123, T9 ABC, T9 abc প্রভৃতি। এসব ব্যবহার করে অক্ষর ফন্ট চেনা করা যায়। টি-৯ ব্যবহার করার জন্য আপনি টি-৯ যুক্ত ধরনটি ব্যবহার করুন। সাধারণত সেটের # (হ্যাশ) বাটন দিয়ে এটি পরিবর্তন করা যায়। সাধারণ মাল্টি ট্যাপ পদ্ধতির চেয়ে এটি (টি-৯) অনেক দ্রুত কাজ করতে পারে। ধরুন, আপনি



# ধূমপানে টিনএজারদের বিপদ বেশি

গৌতম রায়

‘ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর’- শব্দ চারটি অধিকাংশ ধূমপায়ীর কাছেই বিরক্তিকর। সিগারেটের প্যাকেটে এ সতর্কবাণীটি উল্লেখ থাকলেও ফেনার সময় কেউ এটি পড়ে দেখেন কি-না সন্দেহ। বিশেষ করে যারা নতুন সিগারেট ধরছেন কিংবা ‘সিগারেট ছাড়া দুনিয়াটাই বৃথা’ জাতীয় কথাবার্তা যাদের প্রিয়, তাদের কাছে সিগারেটের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া মানে বিভ্রম্নার একশেষ। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আড্ডা মারতে থাকা কিশোর-তরুণ-যুবকেরা যখন সিগারেটের ধোয়া উড়িয়ে ক্ষতিকর এ পদার্থটিকে নিঃশেষ করতে

ধূমপান সব সময়ই ক্ষতিকর। কিন্তু এটি টিনএজারদের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর। একজন বয়স্ক লোক ধূমপান করলে তার শরীরে যে পরিমাণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বা যতোটুকু ক্ষতি হবে, একজন টিনএজারের মধ্যে এ দুটির পরিমাণ হবে তার অনেকগুণ বেশি।

থাকে, তখন তাদের সিগারেটের অপকারিতা সম্পর্কে বলতে গেলে উল্টো আনস্মার্ট উপাধি বয়ে নিয়ে আসাটা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। তাই পারতপক্ষে তাদের কেউ ঘাটাতে চান না। আবার ছেলেদের অনেকে তো মনে করে, মেয়েদের সামনে খুব ভাব দেখিয়ে সিগারেট টানাটানি বীরত্ব প্রকাশের লক্ষণ। যদিও যারা সিগারেট টানে, তাদের প্রতি মেয়েরা ঠিক উল্টো মনোভাবটিই প্রকাশ করে।

শুধু ছেলেদের কথা বলা ঠিক হবে না। অনেক মেয়েই এখন মনে করে, ছেলেরা সিগারেট খেতে পারলে তারা কেনো পারবে না? তবে তাদের যদি বলা হয় ছেলেদের মতো সবার সামনে ধূমপান করতে, তাহলে তাদের অনেকেই সেটি করতে রাজি হবে না। কারণ তাহলে তারা সহজেই রাষ্ট্রায় ‘প্রকাশ্যে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন’ সাইনবোর্ড দেখে বলতে পারবেন না, ‘আমরা তো প্রকাশ্যে ধূমপান করি না, গোপনে করি।’ যাতে ধূমপানও করা হয়, আবার সবার কাছে নিজের মানইজ্জতও বজায় থাকে। এ ধরনের টিনএজারদের কাছে ধূমপানবিরোধী প্রচারণা খুবই কঠিন। দিন দিন তা আরো কঠিন হয়ে পড়ছে। এ চিত্র শুধু

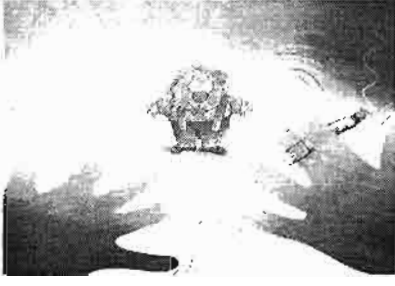
অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। সবচাইতে মজার তথ্য হচ্ছে, তাদের কাছে ধূমপানের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে তারা আদর্শ সেওলো! শোনে কি-না, তা নিয়েই গবেষকদের সন্দেহ বয়োগেছে।

ধূমপান সব সময়ই ক্ষতিকর। কিন্তু এটি টিনএজারদের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর। একজন বয়স্ক লোক ধূমপান করলে তার শরীরে যে পরিমাণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বা যতোটুকু ক্ষতি হবে, একজন টিনএজারের মধ্যে এ দুটির পরিমাণ হবে তার অনেকগুণ বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপানের ফলে টিনএজারদের



আমাদের দেশেই নয়, সব দেশের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে শুধু টিনএজাররাই নয়, একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত মানুষের জন্যও এটা সত্য। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, ১৪ বছর বয়সের নিচের এবং ৩৫ বছরের বেশি বয়সী ধূমপায়ীদের সহজেই ধূমপানের কুফল সম্পর্কে বোঝানো যায়, তাদের উদ্বুদ্ধ করা যায় ধূমপান না করতে। কিন্তু ১৫-৩৪ বছর বয়সীদের কাছে ধূমপানের বিরুদ্ধে কিছু বলাটা





মস্তিষ্ক বয়স্কদের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে অল্প সময়সীমাতেই মস্তিষ্ক অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ১৪ বছরের নিচে যাদের বয়স, তারা ধূমপান শুরু করলেও যদি তাদের উদ্ধৃত্ত করা যায়, তাহলে তারা খুব তাড়াতাড়ি এ নেশা ছেড়ে দিতে পারে। অন্যদিকে যাদের বয়স ৩৫-এর বেশি, তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু মাঝ বয়সীদের ক্ষেত্রে ঘটে উল্টো ঘটনা। এ সময় ধূমপান শুরু করলে সে অভ্যাস সারা জীবন থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ কারোলাইনার ডিক ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার ইন ডারহামের গবেষক এডওয়ার্ড লেভিন মনে করেন, ধূমপানের ক্ষতির জন্য বয়স খুব বড় কোনো ফ্যাক্টর না হলেও ১৫-৩৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে ধূমপান সারাজীবনের জন্য স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। কারণ এ সময় তাদের মস্তিষ্কে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থের আনাগোনা দেখা যায় যেগুলো এ বয়সের কিছু বৈশিষ্ট্য স্থায়ী করে রাখতে মূল ভূমিকা পালন করে।

বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য লেভিন কিছু গবেষণাও পরিচালনা করেন। তিনি দেখেন, একজন বয়সী নারীর তুলনায় ১৫ বছরের একটি বালিকার সিগারেট ছাড়তে খুব বেশি কষ্ট হয়, তার পেছনে সময় দিতে হয় অনেক বেশি এবং তাকে দিনের পর দিন বোঝাতে হয়। সেটিও সম্ভব হতো না যদি না বালিকা নিজে থেকে উপলব্ধি করতো যে, ধূমপান তার শরীরে নতুন কিছু উপসর্গ সৃষ্টি করছে। যে কারণে সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং ধূমপানের কারণেই সে হয়তো কোনোদিন মা হতে পারবে না। হলেও তার শিশু অসুস্থ অবস্থায় জন্মাতে পারে।

লেভিন মনে করেন, টিনএজ সময়টাকেই প্রথম মস্তিষ্কে কিছু র্যাডিক্যাল পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তনের মূল কারণ বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন। এটা ঠিক যে, জন্মের পর প্রথম ৬-৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মস্তিষ্ক সবচাইতে বেশি বাড়ে। কিন্তু মস্তিষ্কের পূর্ণতা আসতে আসতে সেই মস্তিষ্কের অন্তত টিনএজ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ বয়সে মস্তিষ্ক নতুন নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে পূর্ণ হতে থাকে, শিখতে থাকে নতুন নতুন জ্ঞান। ফলে মস্তিষ্কে ক্রমাগত প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় তথ্য সঞ্চিত হতে থাকে। এ তথ্যগুলোই পরবর্তীকালে তার ব্যক্তিত্ব ঠিক করে দেয়, মানুষ হিসেবে তার

দ্রুত কি রকম হবে, সেটিও মোটামুটি এ সময়ে ঠিক হয়ে যায়। ফলে এমন সময় যদি কেউ ধূমপানে আসক্ত হয়, তাহলে মস্তিষ্ক সেটিকেও নতুন তথ্য হিসেবে ধরে নেয় এবং স্থায়ী করার চেষ্টা চালাতে থাকে। ফলে এ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। যে কারণে ধূমপান শুরু করার জন্য এটি খুব বিপজ্জনক একটি বয়স।

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, উন্নত বিশ্ব তো বটেই, অনুন্নত বিশ্বেও অধিকাংশ ধূমপায়ীই এ টিনএজ বয়সে ধূমপান করতে শেখে। ফলে পরবর্তী জীবনে শারীরিক মারাত্মক কোনো উপসর্গে আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ধূমপান ছাড়তে পারে না। বার্ট্রান্ড রাসেল নাকি বলেছিলেন, 'ধূমপান ছাড়া পৃথিবীর সবচাইতে সহজ কাজ। আমি তো এ পর্যন্ত কয়েকবার ধূমপান ছেড়েছি।' রাসেলের এ মন্তব্য উজ্জীবিত হয়ে অনেকে হয়তো ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু মস্তিষ্কের তাড়নায় তারা কিছুদিন পরই পুরনো অভ্যাসে ফিরে যান।

গবেষকরা দেখেছেন, ৮-৮ শতাংশ মানুষই ধূমপানে আসক্ত হয় ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে। যদিও এ সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়াব দরুন তাদের সিগারেট খাওয়া তো দূরের কথা, হাতে থাকলেও নিষেধ বা তাদের কাছে সিগারেট বিক্রি করাও নিষেধ।

গবেষকরা তাদের গবেষণায় একদল ধূমপায়ী তরুণকে সিগারেট একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিকোটিন কিছু রাসায়নিক যৌগের সাথে মিশিয়ে ৪০ দিন ধরে দিয়েছেন। ঠিক একই পরিমাণ নিকোটিন ও রাসায়নিক যৌগ তারা ৭০ দিনে দিয়েছেন ৩৫ বছরের বেশি বয়সীদের। তারপরও দেখা গেছে, তরুণরা বেশি বয়সীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ সিগারেট নিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, রাসায়নিক এ যৌগের কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় সেটি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যোহেতু মস্তিষ্ক এ সময়ের বিশেষত্বের স্রষ্টার হওয়ায়, তাই তরুণদের মস্তিষ্ক পরবর্তী সময়ে সিগারেট গ্রহণে তাড়না সৃষ্টি করেছে। মস্তিষ্কের দুটি অংশ মূলত এ সময়ে বেশি সক্রিয় থাকে। এর একটি হচ্ছে ফ্রন্টাল কর্টেক্স এবং দ্বিতীয়টি হিপোক্যাম্পাস। ধূমপানের সব তথ্য এ দুটি অংশেই বেশি জমা থাকে এবং ফলে এ দুটি অংশই ক্ষতিগ্রস্তও হয় সবচাইতে বেশি। এ অংশে অন্যান্য যেসব তথ্য জমা থাকে, অব্যাহত ধূমপানের ফলে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেগুলো পরে নষ্ট হয়ে যায় বা সেগুলো দিয়ে কোনো কাজ সম্ভব হয় না। শুধু মস্তিষ্কের এ দুটি অংশই নয়, আরো কয়েকটি অংশ পারোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞানমূলক অংশ সবচাইতে বেশি বিকশিত হয় টিনএজ সময়ে। এ সময়টাতে একজন মানুষ যেভাবে পৃথিবীকে বুঝতে পারে, যেভাবে পর্যবেক্ষণ করে কিংবা যেভাবে তার পৃথিবী সাজাতে চায়, পরবর্তী সময়ে মূলত তাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে এ সময়ের মধ্যেই তৈরি করে। ফলে কেউ যদি এ সময়ে সিগারেটে আসক্ত হয়

যায়, তাহলে এর অর্থ একটাই দাঁড়ায়— সে নিজেকে সিগারেটের জন্যও তৈরি করছে।

এ গবেষণা থেকে লেভিন আরো কয়েকটি বিষয় দেখতে পেয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, মানুষের মনের শক্তি অসীম। কেউ যদি খুব চিন্তাভাবনা করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ় মনোভাব তার মধ্যে থাকে, তাহলে সে খুব সহজেই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করতে পারে। অর্থাৎ মানসিক দিক থেকে সে যতো শক্তিশালী হবে, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন তার জন্য ততোই সহজতর হয়ে যাবে।

লেভিনও তার পরীক্ষায় একই ফল দেখতে পেয়েছেন। টিনএজ সময়ে যারা সিগারেট ধরেন, তাদের মধ্যে থেকে তিনি কয়েকজনকে বাছাই করে তাদের মানসিক শক্তির পরীক্ষা নিয়ে তাদের সিগারেট ছাড়তে উদ্ধৃত্ত করেন। তিনি দেখতে পান, যাদের মানসিক শক্তি খুব বেশি অর্থাৎ নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কিংবা নিজের কমিটমেন্টের প্রতি যারা স্থির, তবে খুব তাড়াতাড়ি সিগারেট ছাড়তে পেরেছে। তিনি তাই মনে করতেন সিগারেট ছাড়ার জন্য আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট। বাক্যটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। অন্যদিকে যারা কিছুটা হলেও দোদুল্যমানতায় ভুগছে, তাদের অনেকেই সিগারেট ছাড়তে পেরেছে কিন্তু এজন্য তাদের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে অনেক বেশি। তবে তাদের সংখ্যাটা খুবই কম। অধিকাংশই এ দোদুল্যমানতার কারণে শেষ পর্যন্ত সিগারেট ছাড়তেই পারেনি। তাই যারা অন্তত বুঝতে পারছেন, সিগারেট শরীরের কোনো উপকারে তো আসেই না, বরং ক্ষতি করে অনেক, তাদের প্রতি অনুরোধ রইলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আজই সিদ্ধান্ত নিন, দেখবেন খুব তাড়াতাড়িই সিগারেট তো আপনি ছাড়তে পারছেনই, সিগারেটও আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে। সিগারেটের সাথে বন্ধুত্ব তো খুবই খারাপ।

বার্ট্রান্ড রাসেল নাকি বলেছিলেন, 'ধূমপান ছাড়া পৃথিবীর সবচাইতে সহজ কাজ। আমি তো এ পর্যন্ত কয়েকবার ধূমপান ছেড়েছি।'





# অ্যান্ড্রোমিডা

## আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী

মোঃ জসীম উদ্দীন খান

মহাকাশে এমনি কোটি কোটি ছায়াপথ আপন পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ড্রোমিডাও এমনি একটা ছায়াপথ। পারিবারিক সদস্য সংখ্যার দিক থেকে আকাশগঙ্গার চেয়ে এটি বহুগুণ বড়।

**নি**র্মল স্নিগ্ধ রাতের আকাশে আমরা আগের যে সমাবেশ দেখি তা কিন্তু একক কোনো সংগঠন নয়। দল বেঁধে চলা প্রাণীদের মতো এরাও ছুটে চলছে অসীমের পানে। লক্ষ কোটি তারকারাজি নিয়ে গঠিত হয় এক একটি ছায়াপথ। আমাদের সৌরজগৎ (Solar system) যে ছায়াপথে অবস্থিত তার নাম যিকিওয়ে বা আকাশগঙ্গা। শীতের রাতে উত্তর দিগন্ত হতে দক্ষিণ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আলোর যে দীর্ঘপথ দৃষ্টিগোচর হয়, এটাই আমাদের চিরচেনা আকাশগঙ্গা। মহাকাশে এমনি কোটি কোটি ছায়াপথ আপন পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ড্রোসিডাও এমনি একটা ছায়াপথ। পারিবারিক সদস্য সংখ্যার দিক থেকে আকাশগঙ্গার চেয়ে এটি বহুগুণ

বড়। বিজ্ঞানীদের ধারণা অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথে কম করে হলেও ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। সংখ্যাটি এত বিশাল, যা আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। অ্যান্ড্রোমিডা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। কারণ অন্যসব ছায়াপথ হতে এটি আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার্লস মেসিয়ার আকাশের তারাস্তবক ও ছায়াপথের একটা তালিকা তৈরি করেন, যাতে অ্যান্ড্রোমিডার অবস্থান ৩১ দেখানো হয়েছে, যার জন্য সংক্ষেপে একে M31 নামেও চিহ্নিত করা হয়। গ্রিক পুরাণে এ ছায়াপথটির বহু রূপকথা চালু আছে। ইথিওপিয়ার রাজা সিফিরাস ও রানী ফ্যাসিওপিয়ার মেয়ে হলো অ্যান্ড্রোমিডা। সমুদ্র দেবতা



নিসিয়াসের মেয়ের চেয়েও বেশি সুন্দরী বলে অ্যান্ড্রোমিডার গর্ব ছিল একটু বেশি। এতে সমুদ্র দেবতা রুট হয়ে ইথিওপিয়ানীকে হত্যা করার জন্য বহু সংখ্যক সাপ পাঠালেন। বহু লোক মারা যেতে থাকলো। রাজা জানতে পেরে মেয়েকে সাপের মুখে তুলে দিলেন। সেই থেকে অ্যান্ড্রোমিডা শৃঙ্খলিত অবস্থায় আছে। এমনকি আরো কত কাহিনী তৈরি হয়েছে তার হিসাব নেই।

দশম শতাব্দীতে আরব জ্যোতির্বিদ আল সূফী সর্বপ্রথম এ ছায়াপথটির কথা উল্লেখ করেন এবং তিনি একে ছোট 'সর্পীয় মেঘের টুকরো' বলে বর্ণনা করেন। এরপর ইউরোপে কেবল সপ্তদশ শতাব্দীতে সাইমন সেরিয়াস নামের একজন জ্যোতির্বিদ এটি লক্ষ্য করেন। গ্যালিলিও ১৬৪২ সালের ১৫ ডিসেম্বর তার নভোবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এটা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লিখে গেছেন 'খ' বস্তুটির কেন্দ্রের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে জ্যোতির্বিদ হার্শেল বলেন, অ্যান্ড্রোমিডা হলো অসংখ্য তারার বিশাল সমষ্টি। এ সময় পর্যন্ত এটা নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছিল। বিতর্কটা ছিল, এটা আমাদের গ্যালাক্সির ভেতরে না বাইরে এটা নিয়ে?

এরপর ১৯২৪ সালে উইলসন পর্বত মান মন্দিরের ১০০ ইঞ্চি প্রতিফলক নভোবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অ্যান্ড্রোমিডা হাবল অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকাকে তার অন্তর্ভুক্ত তারায় বিশ্লেষণ করেন। আমাদের চেনা সৌরজগতের মতো তথা আরো বিশাল এক বিশ্বের সন্ধান পান তিনি। এখন পর্যন্ত আরো বহু সংখ্যক ছায়াপথের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। অ্যান্ড্রোমিডা আমাদের ছায়াপথ হতে ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। ব্যাস মোটামুটি ১.৩০ আলোকবর্ষ। আমাদের আকাশগঙ্গার



অ্যান্ড্রোমিডার কেন্দ্রস্থল অসংখ্য লাল তারায় বিভক্ত। কেন্দ্র থেকে যতই প্রান্তের দিকে যাওয়া যায় ততই লাল তারার পরিবর্তে নীল দানব তারা দেখা দিতে থাকে।

ব্যাস ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। তাই বলা যায়, অ্যান্ড্রোমিডা (M31) ছায়াপথটি আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে অবস্থিত। অ্যান্ড্রোমিডাই একমাত্র ছায়াপথ, যা খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায়। জুলাই মাসের সন্ধ্যার পূর্বকাশে আর ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যায় পশ্চিমাংশে অস্ত যায়। অক্ষরার রাতে এটাকে চিনতে তেমন কষ্ট হয় না। কিছুটা উজ্জ্বল একটা ডিম্বাকৃতি দাগের মতো এ ছায়াপথের ব্যাস ১/৪° বা ১৫ মিনিট। এটুকু হলো

ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অংশ। অ্যান্ড্রোমিডা আকাশের প্রায় ১৮ বর্গ ডিগ্রি এলাকা অধিকার করে আছে, যা চাঁদের আয়তনের ৭০ গুণ বেশি। আমরা যদি এটাকে খালি চোখে দেখতে পেতাম তবে তা সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক-তৃতীয়াংশের সমান হতো। অ্যান্ড্রোমিডা বেশ উন্নত শ্রেণীর একটি ছায়াপথ, যার তিনটি অংশ আছে-কেন্দ্রীয় অংশ, প্রান্তদেশ ও তারান্তবকের অংশ। এর কুণ্ডলীগুলো অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। জ্যোতির্বিদ ওয়াস্টার বাদে এ ছায়াপথের বিশেষ গবেষণা করেন। তিনি এ ছায়াপথটির নানাভাবে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, অ্যান্ড্রোমিডার কেন্দ্রস্থল অসংখ্য লাল তারায় বিভক্ত। কেন্দ্র থেকে যতই প্রান্তের দিকে যাওয়া যায় ততই লাল তারার পরিবর্তে নীল দানব তারা দেখা দিতে থাকে। আর অ্যান্ড্রোমিডার কুণ্ডলী বাহুতে অতি দানব তারাদের বাস। এর আবার দুটি উপছায়াপথ আছে। অর্ধোজ্জ্বল তারাগুলোর সবই লাল দানব প্রকৃতির। এছাড়া এমন কোনো নতুন নীল তারা নেই এবং এমন কোনো গ্যাস বা ধূলিকণা নেই, যা দিয়ে পরবর্তীতে নতুন তারার জন্ম হতে পারে।

মহাবিশ্ব কতটা বিশাল আর বিস্তৃত তা মানবকুলের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। তারপরও আমরা নিত্য নতুন বস্তু আবিষ্কার করে চলেছি অনবরত। আকাশ আমাদের বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে তার অসীমের পানে। আমরা তো ঐ বিশাল মহাবিশ্বেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। যত ক্ষুদ্রই হই না কেন আমরা ঐ বিশালত্বকে নিয়ে ভাবতে পারি, সার্থকতা আমাদের সেখানেই।





# ভয়ঙ্কর আমাজান

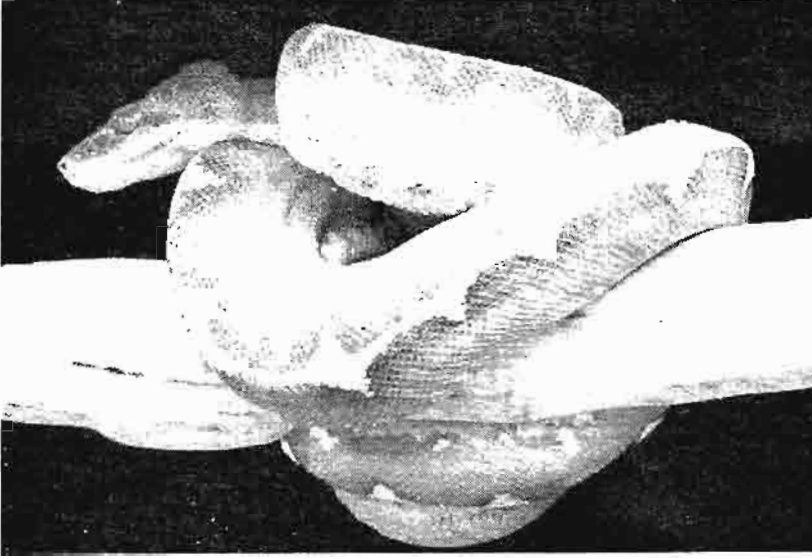
শেখ আনোয়ার

আমাজানের জঙ্গল যত  
ভয়াবহ, অশুভ এবং  
আতঙ্কের, পৃথিবীর আর  
কোনো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমির  
প্রকৃতি এত ভয়ঙ্কর নয়।  
এখানকার ক্ষুরদাঁতের খুঁদে  
পিরানহা জীবন্ত কিংবা মৃত  
কোনো প্রাণীকে বাগে পেলে  
কয়েক মিনিটের মধ্যে হাড়  
ক'খানা অবশিষ্ট রাখে।

ঢা কার রাস্তা আর আমাজানের জঙ্গলের  
মধ্যে পার্থক্য তেমন একটা নেই। দু  
জায়গাতেই মানুষের প্রাণ হাতে করে  
চলতে হয়। ব্রষ্টির নাম জপতে জপতে রাজধানীর  
ব্যস্ততম সড়কগুলোর যে কোনো একটাতে  
আপনি বের হলেন। কিন্তু কেউ গ্যারান্টি দিতে  
পারবে না হাঁ হাঁ করে ছুটে আসা দানব ট্রাক  
কিংবা বাসেব মৃত্যুখাড়া থেকে আপনি প্রাণটা  
নিয়ে ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারবেন  
কিনা। তেমনি আমাজানের জঙ্গলে বিপদসঙ্কুল  
দুর্গম বন-বাদাড় ভেদ করে প্রকৃতির সাথে  
আত্মহারা হতে গিয়ে টেরই পাবেন না কখন বৃশ  
মাস্টারের বিষাক্ত ছোবলে অন্ধা পেয়েছেন কিংবা  
প্রকাণ্ড অ্যানাকোন্ডার দানবীয় বাঁধনে আনুভর্তা  
হয়ে গেছে।

আমাজানের জঙ্গল যত ভয়াবহ, অশুভ এবং  
আতঙ্কের, পৃথিবীর আর কোনো গ্রীষ্মমণ্ডলীয়  
বনভূমির প্রকৃতি এত ভয়ঙ্কর নয়। এখানকার  
ক্ষুরদাঁতের খুঁদে পিরানহা জীবন্ত কিংবা মৃত  
কোনো প্রাণীকে বাগে পেলে কয়েক মিনিটের  
মধ্যে হাড় ক'খানা অবশিষ্ট রাখে। এদের হিংস্র  
স্বভাবের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রকাণ্ড হাস্কর  
শ্রেফ দুধের শিশু। একমাত্র আমাজানের নদীতেই  
বিনম্রুটে চেহারার অতি ক্ষুদ্র ক্যাভিক মাছের  
দেখা মেলে। এদের বিষাক্ত শিশুর একটা গুঁতো  
খেলে আপনার ভবলীলা সাস হাতে মোটেও দেড়ি  
হবে না। অথচ মাছটা অংকারে তেমন একটা বড়  
নয়। প্রাপ্তবয়স্ক একটা পুরুষ পিরানহা লম্বায় বড়  
জোব আট ইঞ্চি হয়ে থাকে। বলিভিয়া এবং  
ব্রজিল সীমান্তের কাছে উপনদীতে এ ভয়ঙ্কর





আমাজনের তীরে কিলবিল করে বিযাক্ত সব সাপ। বুশ মাস্টার সেগুলোরই একটি। পনেরো ফুট লম্বা এ সাপের শরীরের সবচেয়ে চওড়া অংশ এক ফুটও হয় থাকে। ভয়ানক হিংস্র স্বভাব এ সাপ মাড়ি দিয়ে

মাছ বাস করে। বর্ষার মতো উষ্ণ নাক, ছুরির ফলার মতো ধারালো দাঁত, সূঁচের সব কাটা ওদের চেহারাকে ভীতিকর করে তুলেছে। চোয়াল জুড়ে ফুরধার দাঁতের সারি সব সময় খাই খাই করে। এক কামরে এর শিকারের দেহ থেকে মৎসের টুকরো নিপুণ দক্ষতায় কেটে নেয়। ওদের এ বিখ্যাত দাঁতের কৃথ্যটি সর্বজনবিদিত। মৃত কিংবা জীবিত যাকেই নাগালে পাক না কেন, মুহূর্তের মধ্যে ছিড়েখুড়ে শেষ করে দেয়। আমাজনে সঁতাভ কাটার মতো বিপজ্জনক কাজ আব নেই। কিন্তু তবুও কোনো কোনো লোককে নিত্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদে ঝুঁকি নিয়েই নদী পেরুতে হয়। তবে নদীতে নামার আগে এরা ভালো করে শরীর পরীক্ষা করে নেয়। এ কোনো রকম কট্টা হেঁচা কিংবা ক্ষত অঙ্গ কিন। মৎস্য আমাজনের ভাপন। অবহণে এর উড়ে বেড়ানো বিধাত হুঁই আর কীটপতঙ্গের কামড়ের দাপের চিরুবিহীন মানুষ সেখানে খুঁজে পাওয়া নিতান্তই দুর্লভ। ইলেক্ট্রিক ঈল আমাজনের আরেক ভীতি। এ বাইন মাছের বৈদ্যুতিক শক্তি এতই তীব্র যে, মানুষ মুহূর্তেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুও ঘটে। এক ধরনের ঈল মাছ আছে, নাম-পুমান। এরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। জলচর প্রাণীরা মারাত্মক ভয় করে সাপের মতো এ কৃৎসিত মাছকে। আমাজনের তীরে কিলবিল করে বিযাক্ত সব সাপ। বুশ মাস্টার সেগুলোরই একটি। পনেরো ফুট লম্বা এ সাপের শরীরের সবচেয়ে চওড়া অংশ এক ফুটও হয়ে থাকে। ভয়ানক হিংস্র স্বভাব এ বুশ মাস্টারের। বাগে পেলে এরা মানুষকে ছোবল মারে। ওদের বিযাক্ত ছোবলে মুহূর্তেই মৃত্যু ঘটতে পারে যে কারণে। এমনি আরেকটা বিযাক্ত সাপের নাম নানানিনা। দেখতে বিশাল এ সাপ কোনো রকম প্রয়োচণা ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে উঠে। চোখের সামনে মানুষ দেখতে পেলেই হলো। হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে ছোবল দেয়ার জন্য। খুবই হিংস্র এই সাপ

অবিস্বাস্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর করতে পারে আমাজনের গহীন অরণ্যে সাপ যেন কিলবিল করছে। যে কেউ যে কোনো অসাবধানী মুহূর্তে সাপের কামড়ে মারা যেতে পারে। কিছু সাপ আছে দেখতে ছোট। কিন্তু সাংঘাতিক বিযাক্ত। খালি পায়ে যারা এ জঙ্গলে হাঁটে তাদের জন্য এ সাপগুলো আজবাইলের মতো। কত যে স্থানীয় অধিবাসীর জান কবচ করেছে এ আজবাইলরা তার ইয়ত্তা নেই। যে সাপকে নিয়ে আমাজনের গল্প কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছে তার নাম অ্যানাকোন্ডা। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর সকল সাপের 'বাজ' এর' কেউ কেউ বলেন, 'তব' ৬৫ ফুট লম্বা অ্যানাকোন্ডাও নেই। 'অ্যানাকোন্ডা' যেমন গাছের ডালে পাক খেয়ে কুল খাবে তেমনি পানিতে, কাদা মাটিতে শরীর মিশিয়ে ওৎ পেতে থাকে শিকারের জন্য। পাখি কিংবা স্তন্যপায়ী প্রাণীই তার প্রধান লক্ষ্য। তাই বলে মানুষ খেতে অরুচি নেই তার। সুযোগ পেলেই খপ করে ধরে ফেলে। আর ভয়ঙ্কর বাঁধনে একবার কাউকে জরতে পারলে তার দফা সারা। এ সাপের বিশাল দেহের দানবীয় শক্তির কোনো তুলনা নেই। অ্যানাকোন্ডার ভয়ে জঙ্গলে ববার সংগ্রহকারীরা একত্র হয়ে কাজ করে। জোট ছেড়ে একা যায় না কেউ। কারণ যারা একা কাজ করতে গেছে তাদের আর কোনো দিন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমাজনের সব জীবন্ত প্রাণীই ভয়ঙ্কর। ওখানকার একেকটা মৌমাছির চেহারাও এত ভয়ানক যে দেখেই ভিমরি খেতে হয়। আর এদের গুঞ্জে মনে হয় মোটরগাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে। আমাজনের সব পতঙ্গের ছলেই আছে তীব্র বিষ। একটা কামড় খেলে বিনে পরস্যা বিভিন্ন রঙের তারা দেখতে পাবেন চোখের সামনে। আর কালো কালো প্রকাণ্ড মাকড়সার চেহারা এতই বিকট যে, মাত্র একটির দংশন

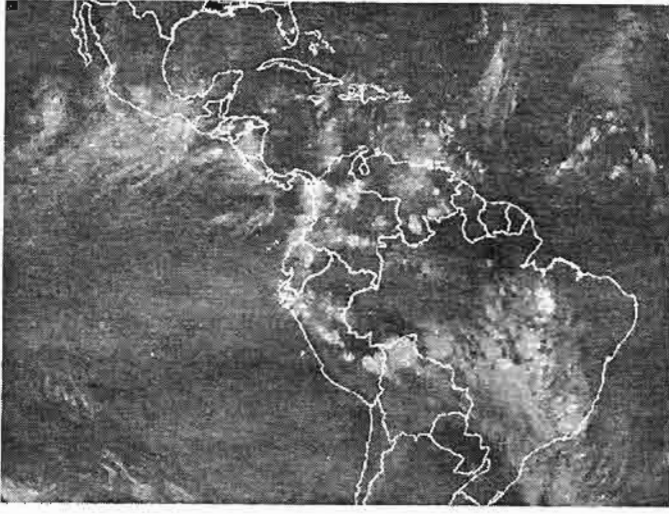
মানে রাতের পব রাত দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। আর ওদের কামড় খাওয়ার অর্থ সটান ওপারে যাওয়া।

আমাজনের পিপড়েরা সাইজে এতই বড় যে, আপনি দিবি। ওদের মার্চ করে এগিয়ে চলার শব্দ শুনেতে পাবেন। লাখ লাখ পিপড়ে সারি বেঁধে এগিয়ে চলে। ওরা যখন চলে হিসহিসে একটা ভীতিকর শব্দ ওনেতে পাওয়া যায়। এ পিপড়ে চলার পথে কোনো বাধা মানে না। সামনে যা পায় তা সাবাড় করতে করতে এগিয়ে যায়। আপনি যদি সময় থাকতে ওদের পথ থেকে সরে না, দাঁড়ান, চোখের পলকে ওরা ছেঁকে ধরবে আপনার শরীর। পিরানহা কামড়, বুশ মাস্টারের ছোবল, মৌমাছির ছল কিংবা মাকড়সার দংশনের চেয়ে কোনোও অংশে কম নয় ওদের এ যন্ত্রনাদায়ক আক্রমণ। পিপড়ে আসছে খবর পেলে আমাজনের লোকজনের

মধ্যে দাবানল ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ঘরবাড়ি ছেড়ে সবাই পালাতে শুরু করে। বিরাট বিরাট গাছ আমাজনের জঙ্গলকে প্রায় অন্ধকার করে রেখেছে। সেই অন্ধকার দূর করার সাধ্য সূর্যেরও নেই। প্রকাণ্ড গাছগুলোর পঁচা গুড়ির নিচে নোংরা ভোবাগুলো থেকে ভেসে আসা বীকট গন্ধ মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলার জন্য যথেষ্ট। সবুজ আঠাল এটেল মাটি পা আটকে ধরে চোরাবালির মতো। এই হচ্ছে আমাজন। ভয়ঙ্কর আমাজন। তবু এ ভয়ঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তারই নেশায় যুগ যুগ ধরে ভ্রমগণিপাসু মানুষ এখানে অসংখ্য। অনেক কিছুই তাবা আরিকার কারত্ব। হৃৎপ্পুরেও অনেক বহন এখানে মন বিকৃতই হয়ে গেছে।

সূত্র : ন্যাশনাল জিওগ্রাফি।





# হারিকেন ক্যাটরিনা

নুসরাত রহমান

**বি**শ্বের পরাক্রমশালী দেশটির নাম কি? উত্তর একটাই— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বিশ্বের প্রেসিডেন্ট বলে থাকেন। সন্দেহ নেই শক্তি, প্রাচুর্য কিংবা চাতুর্যে যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এসব প্রাচুর্যের মাঝখানে আমেরিকান প্রশাসন একটা কথা বোধ হয় বেমানান ভুলে গিয়েছিল যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়।

সারা বিশ্বকে কজা করার মহাপ্রয়াসের মাঝে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একত্রিত নয়, তা বৃশ প্রশাসন বোধ হয় চিন্তা করেনি। হয়ত ভেবেছিলেন এ শক্তি মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমেরিকানদের হাতেই রয়েছে। সেদিক বিবেচনায় হয়ত 'ক্যাটরিনা' মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

তাই হারিকেন ক্যাটরিনা অনেকটা নির্বিঘ্নেই আঘাত হানতে সমর্থ হয়। সৃষ্টি করে আরেক দুঃখজনক অধ্যায়ের। সে দুর্দশার বিষয় নিয়েই এ প্রতিবেদন লেখা হয়েছে।

**হারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানে ২৯ আগস্ট :**

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে আমেরিকাবাসীর পরিচয় নতুন বিষয় নয়। মাঝে মাঝে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনেছে আমেরিকায়। সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখ করা যেতে পারে গত বছর হারিকেন ইভানের কথা। এ বছর অঘাত হানে হারিকেন ডেনিস। এর প্রভাবে ফ্লোরিডার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে হারিকেন ক্যাটরিনা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হারিকেন ক্যাটরিনার অবিরত সম্পর্কে

সর্বপ্রথম ধারণা পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (National Hurricane Center) থেকে। সংস্থাটি ২৩ আগস্ট ২০০৫ বিকেলে ব্রডকাস্টের মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব বাহ্যায়র ওপর উষ্ণমণ্ডলীয় নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এটি ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। সংস্থাটি এর নামকরণ করে ট্রপিক্যাল ডিপ্রিসিয়েশন (টিডি) ১২ নামে (Tropical Depression (TD-12)।

সারা রাত পর্যবেক্ষণের মধ্যে রেখে বিশেষজ্ঞগণ ২৪ আগস্ট ঘোষণা দেন নিম্নচাপটি হারিকেনে পরিণত হয়েছে। এর একদিন পর হারিকেনটি ফ্লোরিডার হেলেনডেইল বিচ-এর মধ্য দিয়ে





হ্যারিকেন ক্যাটরিনার ধ্বংসাবশেষ

স্থলভূমি অতিক্রম করে। ২৬ আগস্ট হ্যারিকেন ক্যাটরিনা স্থান অতিক্রমের ফলে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্টরা তখন একে হ্যারিকেন-এ (ক্যাটাগরি-২) বলে চিহ্নিত করেন। অবশেষে ঝড়টি আরো ঘনীভূত হয়ে প্রবল আকার ধারণ করে ২৮ আগস্ট। এ সময় ঝড়টি ক্যাটাগরি-৪-এ পরিণত হয় এবং একই দিন সন্ধ্যার দিকে ঘোষণা করা হয় হ্যারিকেন 'ক্যাটরিনা' চরম আকার ধারণ করে ক্যাটাগরি-৫ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৮০ কিলোমিটার। এটি উত্তরোত্তর ঘণ্টায় ৩৪৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যা ছিল ২৭ আগস্টের চেয়ে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১৬৫ মাইল বেশি। সংশ্লিষ্টরা এ সময় বাতাসের গড় গতিবেগ নির্ধারণ করেন ঘণ্টায় ২৩৫ কিলোমিটার। সারা রাত ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয়ের পর হ্যারিকেন ক্যাটরিনা অবশেষে ২৯ আগস্ট ২০০৫ যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানাতে আঘাত হানে। এ সময় হ্যারিকেন ক্যাটরিনার সর্বনিম্ন চাপ ছিল ২৭.১০৮ ইঞ্চি বা ৩/৪ m bar (hpa)। এরপর পরপরই মাত্র কয়েক ঘণ্টা ব্যবধানে ঝড়টি আবার আঘাত হানে লুইজিয়ানা-মিসিসিপি বর্ডারে। এ সময় ঝড়টির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বা ১২৫ মাইল। এ সময় ঝড়ের তোড়ে জলোচ্ছ্বাসের আকার প্রায় ১৫ ফুট থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সমকক্ষতার তোড়ে গড়ে প্রায় ২৪.৩ ফুট উচ্চতা নিয়ে তা আঘাত হানে নিউ অরলিন্সে। এতে নিউ অরলিন্স শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায়। সে জলোচ্ছ্বাস আরো বহুদূর ধাবিত হয়ে আলবামা থেকে ফ্লোরিডা উপকূল পর্যন্ত সমস্ত এলাকা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আবহাওয়াবিদদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এত বড় জলোচ্ছ্বাস কখনো হয়নি। এটিকে তৃতীয় সর্বোচ্চ ভয়ঙ্কর হ্যারিকেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশেষে সমস্ত ধ্বংসাবশেষের অবসান হলে ৩১ আগস্ট সংশ্লিষ্ট আবহাওয়া বিভাগ ঘোষণা দেয় হ্যারিকেন ক্যাটরিনা নিষ্ক্রিয় হয়ে উত্তর-পূর্ব কানাডার দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

### ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ :

হ্যারিকেন ক্যাটরিনা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি উপকূলবর্তী রাজ্য লুইজিয়ানা, মিসিসিপি ও আলবামাতে আঘাত হাতে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হ্যারিকেন ক্যাটরিনার আঘাতে ক্ষয়ক্ষতি প্রবল হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রাথমিক হিসাবে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি ডলার ধরা হলেও তা ছাড়িয়ে গেছে। হ্যারিকেন ক্যাটরিনার আঘাতে মায়ামিডেড-ব্রাওয়ার্ড কাউন্টির এলাকা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মেক্সিকো উপকূলবর্তী নিউ অরলিন্স শহরে। এ শহরের ৮০ শতাংশ এলাকা পানিতে ডুবে গেছে।

মায়ামি-ডেড কাউন্টিতে মারা গেছে প্রায় ৭ জন এবং আহত হয়েছে সহস্রাধিক। জানা গেছে, ১৫ সহস্রাধিক বাংলাদেশীসহ ১২ লক্ষাধিক লোকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রায় ২ লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ে মিসিসিপি নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। প্রধান প্রধান প্রশাসনিক ভবনগুলো পানিতে ডুবে গেছে। লুইজিয়ানার নিউ অরলিন্স শহরের তেল শোধনাগার বন্ধ হয়ে গেছে। অরলিন্স শহরের মেয়র এরই মধ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে উদ্ধার কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত সকলকেই শহর ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিউ অরলিন্স শহরের কনভেনশন সেন্টারে প্রতিদিনই প্রায় ২৫ হাজার মানুষ ভিড় করছে একটু খাদ্য, পানি ও আশ্রয়ের আশায়। পর্যাপ্ত ত্রাণ পাওয়া যায়নি এখনো। সুপার স্টেডিয়ামে অবস্থান নেয়া হাজার হাজার লোক মানবেতর জীবনযাপন করছে। এসব সেন্টারের আশেপাশে পলিথিনে মুড়িয়ে মৃত ব্যক্তিদের লাশ রাখা হয়েছে। উৎকট গন্ধ ভরে গেছে সমগ্র এলাকা। প্রতিদিনই আসছে নতুন নতুন মৃত্যুর খবর। গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রতিবেদনে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হ্যারিকেন ক্যাটরিনায় প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার (৯১,০০ বর্গ মাইল) এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। মোট বেকারভাতার দাবি উঠেছে প্রায় ১৫ হাজার। উপরন্তু দেখা গেছে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার। অন্যদিকে হ্যারিকেনের ফলে আমেরিকা আরেকটু বেকায়দায় পড়েছে। কেননা, এ হ্যারিকেনের ফলে সেখানে অবস্থানরত কয়েকশ বিদেশীরা কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এত সব সমস্যার মাঝে ন্যাক্সারজনক বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে প্রায় সময়ই। উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে লুট, জখম, হত্যা, ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য ঘটনা। এ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে নিউ অরলিন্সের মেয়র রে ন্যাগিনেব নির্দেশ দেন সতাই অবাক হতে হয়েছে। চরম পরিস্থিতিতে প্রায় দেড় হাজার পুলিশ কর্মকর্তা বাধ্য হন ত্রাণকার্য থেকে সরে এসে লুটতরাজ বন্ধে ভূমিকা পালন করতে।

হ্যারিকেন ক্যাটরিনা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যর্থ বলেই সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিধ্বস্ত ডাকযোগাযোগ কিংবা টেলিফোন ব্যবস্থা এখনো সংস্কার বা চালু করা সম্ভব হয়নি। ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (ফেমা) দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বুশ এর নির্বাহীকে সরিয়ে দিয়ে গুরুদায়িত্ব (:) পালন করেছেন। অভিযোগ রয়েছে এর কার্যকারিতা নিয়ে জর্জ বুশ এর মধ্যে কংগ্রেসে আবেদন করেছেন জরুরি ত্রাণ সাহায্যের জন্য। কংগ্রেস এ খাতে ৫ হাজার ১৮০ কোটি ডলার অনুমোদন করেছে। অবশ্য এ আগে প্রাথমিকভাবে ১০৫০ কোটি ডলার অনুমোদন করা হয়েছে। বিধ্বস্ত শহরে রেডক্রসসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এর সাথে যোগ হয়েছে ১১ হাজার সৈন্য ও ৪০ হাজার ন্যাশনাল গার্ড সদস্য। সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আরো ৫০ হাজার লোক কাজ করছে। এর বাইরে নিখোজ বিদেশীদের উদ্ধারকার্য পবিচালনার জন্য পেট্রোগান ৮২ এয়ারফোর্স ডিভিশনের ৫ হাজার প্যারাসুটারকে পাঠাচ্ছে। তবে চরম দুর্যোগপূর্ণ এসব এলাকায় এ সাহায্য কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

### মানবতাবোধ সবার মধ্যে বিদ্যমান :

সাম্প্রতিক বিশ্বে আমেরিকা যতটুকু আলাচি ত তার চেয়ে অনেক বেশি সমালোচিত। এর কার্যবিধি নিয়ে অনেকের মাঝেই বেশ অসন্তোষ রয়েছে। তা সত্ত্বেও এহেন বিপদে পৃথিবীর অনেক দেশ এগিয়ে এসেছে বিবেচ্য ভূলে। ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওআইসি, জাতিসংঘ, ওল্ড অফ্রিকান নেশনসসহ সকল সংস্থা এ বিপদে সাহায্য কামনা করেছে। মানবতার খাতিরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল, হেলিকপ্টার, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, পণ্য, অর্থ দিয়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এসব সাহায্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ হলো বাংলাদেশ (১০ লক্ষ ডলার), কুয়েত (৫০ কোটি ডলার), দক্ষিণ কোরিয়া (৩ কোটি ডলার), কাতার (১

কোটি ডলার), জাপান (৭ লক্ষ ডলার), চীন (৫০ লক্ষ ডলার) প্রভৃতি। ইরান ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতি মানবিক বিদ্বেষ বা নিষেধাজ্ঞা ত্যাগ করলে তারা ২ কোটি ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল সাহায্য দেবে। সাহায্যকারী অপর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কিউবা, নরওয়ে, পেরু, স্পেন, আফগানিস্তান, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, জার্মানি, ভেনিজুয়েলা, ভারত, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি।

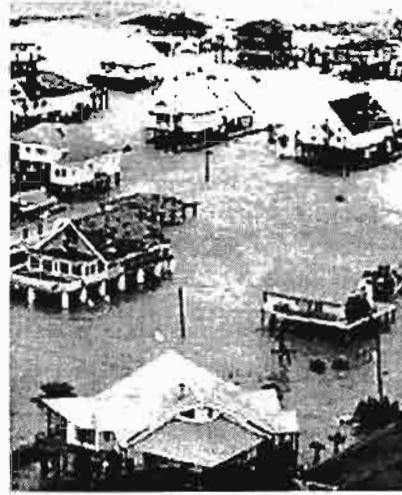
এসব সাহায্যের বাইরে প্রযুক্তিগত সেবাদানের জন্য এগিয়ে এসেছে ইনটেল, মাইক্রোসফট কর্পোরেশন, এএমডি, সিসকো সিস্টেমস লিমিটেড, এসবিসি, কর্পোরেশন, ডেল, আসুস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। ইনটেল ইতোমধ্যেই সেখানে ২০০ কর্মীকে পাঠিয়েছে। প্রায় ১৫০টি তারহীন যোগাযোগ যন্ত্র এবং ডেল ও লেনোভো ১ হাজার ৫০০ নোটবুক কম্পিউটার এখানে বসানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এর ফলে উদ্ধারকার্য অনেক সহজ হবে। এ প্রক্রিয়া গ্রহণের ফলে দুর্ঘণাপূর্ণ এলাকা ও কেন্দ্রের মাঝে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে। এছাড়াও এতে করে তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক টেলিফোন সেবা পাওয়া যাবে। এসব প্রক্রিয়া রেডক্রস ও যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলো একত্রে সম্পন্ন করছে।

বিশ্ববাসী ও আমেরিকানদের প্রতিক্রিয়া : চরম মানবিক বিপর্যয় মুহূর্তে হ্যারিকেন ক্যাটরিনা পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধার ব্যবস্থা নিয়ে স্বয়ং মার্কিনদের যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। বৃশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে হ্যারিকেন ক্যাটরিনার বিপর্যয় রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ক্যাটরিনা মোকাবেলায় প্রশাসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। পাওয়েল বলেছেন, তিনি বুঝতে পারছেন না কেন ক্যাটরিনা আঘাত হানার আগেই কোনো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, 'অসংখ্য আত্মো-আমেরিকানকে অরক্ষিত রাখা হয়েছে, অবহেলা করা হয়েছে।' তবে সবকিছু ছাপিয়ে একটি ব্যাপার অনেকটা স্পষ্ট, তা হলো কৃষ্ণাস্রদের প্রতি অবজ্ঞা।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে অধিকাংশ লোকজন মনে করেন দুর্গতরা কৃষ্ণাস্র না হয়ে শ্বেতাস্র হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হতো। এতে করে বিশ্বের অনেক স্থানে বেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলো এতে বেশ দুঃখ প্রকাশ করেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার মাহাতির মোহাম্মদ পূর্ব থেকেই আমেরিকার নীতির সমালোচনা করে আসছিলেন। এখন তার যেন কিছুটা স্বরূপ দেখা গেল। বিবিসি'র বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'এখন এমন বিপর্যয়কর মুহূর্তে বর্ণবৈষম্য হচ্ছে। রাস্তাঘাটে যারা পড়ে আছে, পেটের চামড়া যাদের বসে গেছে, তাদের অধিকাংশই কৃষ্ণাস্র। তবে সত্যিকার অর্থে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিক্ষার থালা হাতে মার্কিনদের ভিক্ষাবৃত্তির দৃশ্য এ সত্যি অকল্পনীয় বিষয়। কেউ কোনো দিন কি

ভেবেছিল সমৃদ্ধ কিংবা পরাশক্তি আমেরিকার কপালে এমনটি ঘটবে, অথচ বাস্তবে তাই ঘটেছে, সত্যিই সেলুসাস।'

চরম বিপর্যয়ের এ মুহূর্তে সমালোচকরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন কিন্তু বৃশ প্রশাসন তা মেনে নেয়নি। তবে আঘাত হানার পর উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্যে তৎপরতায় ত্রুটি থাকার কথা স্বীকার করলেও প্রেসিডেন্ট বৃশ নিজের কোনে দায় স্বীকার করেননি। উল্টো তিনি ফেডারেল সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা নিয়েও তদন্ত করতে বলেছেন। তবে প্রেসিডেন্ট তার ইরাকি নীতি বিষয়ে আব্বারো সমালোচিত হয়েছেন। যেখানে ইরাক, আফগানিস্তান, জাপান, কোরিয়া কিউবা প্রভৃতি দেশে স্থাপনা রক্ষার্থে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হয় অথচ নিজ দেশের জনগণ না খেয়ে মরে এ নীতি কোন বিবেচনায় সঠিক, তা জানা যায়নি।



জলে ডুবে টেকস

হ্যারিকেন ক্যাটরিনার বিপর্যয়ে প্রভাব :

হ্যারিকেন ক্যাটরিনা শেষ হলেও তার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো ঠিক হতে এখনো দু মাস সময় প্রয়োজন। এ সময়টুকু মার্কিনরা কিভাবে অতিবাহিত করবে তা বোঝা যাচ্ছে না। উপরন্তু এর ফলে কি প্রভাব পড়তে পারে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মার্কিন প্রশাসনের মতে অর্থনীতি কিছুটা ভঙ্গুর হলেও বাজার ঠিক আছে। সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৭ হাজার কোটি ডলার। এত বিশাল ক্ষতির প্রভাব কিভাবে এড়ানো সম্ভব। অন্যদিকে আমেরিকার নীতি নির্ধারণকরা মুনাফা অর্জনে চেষ্টা করছেন। দেখা গেছে, হ্যারিকেন আঘাত হানার পরবর্তী সপ্তাহে করপোরেট মুনাফা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ মুনাফার সম্ভাবনা স্থির থাকবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার লেনদেনের আস্থাসূচক হার কমে গেলেও আপাতত তা স্থির রয়েছে। তেলের দরের প্রভাব নিয়ে সবচেয়ে সমস্যায় রয়েছে আমেরিকা। ক্ষতিগ্রস্ত মেক্সিকো উপকূলবর্তী

উপসাগরে তেল উৎপাদন কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেয়ায় তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলার ৮৫ সেন্টে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে তা বলাই বাহুল্য। এদিকে অর্থনীতির পূর্বাভাসদাতা বহুজাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ) এবং অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইডিসি) হ্যারিকেন ক্যাটরিনাকে অর্থনীতির বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর সাথে আমেরিকান নীতিতে সন্ত্রাসের প্রতি অধিক মনোযোগ এবং ওয়াশিংটনে আমলাতন্ত্রের উদাসীনতার প্রতিকলন ঘটেছে। এ নীতি বিশ্ববাসীর মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে আভাস পাওয়া গেছে, ক্যাটরিনা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্রেতাদের উপর বাড়তি করের বোঝা অথবা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যেই গ্যাসোলিনসহ অন্যান্য জ্বালান সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে বাড়তি অর্থ আদায় করা হচ্ছে। আমেরিকানদের অর্থনীতিতে আরো কিছু বিষয় বাড়তি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে। তার মধ্যে অন্যতম চাপে পড়বে হাউজিং মার্কেট। বিশেষজ্ঞদের মতে জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য ও ক্রমবর্ধমান যুক্তরাষ্ট্রের হাউজিং মার্কেটে 'কারেকশন' ভীতির প্রধান কারণ। এ পরিস্থিতি কতদিন চলবে তা স্পষ্ট নয়। হ্যারিকেন ক্যাটরিনার ফলে বীমাক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে বড় ধরনের বিপর্যয়। তার স্পষ্ট প্রভাব অর্থনীতি নিম্নগামী করায় বাড়তি ভূমিকা রাখবে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে বাড়তি চাপ প্রয়োগ করতে পারে গ্রাহকদের ওপর। সুইজারল্যান্ডের বৃহত্তম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, 'রি-ইন্স্যুরার' বলেছে, এ হ্যারিকেনের বিপর্যয়ে বিশ্বব্যাপী বীমা কোম্পানিগুলো বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হবে। কোম্পানিটি আরও বলেছে, এ বিপর্যয়ে তাদের নিজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০২ কোটি ডলার। সবকিছু ছাপিয়ে এখন আমেরিকা কি করে এসব প্রভাব দূর করবে তাই দেখার বিষয়।

হ্যারিকেন ক্যাটরিনার তাগব শেষ হওয়ায় আমেরিকাবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি কতক্ষণ স্থায়ী থাকবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কেননা সম্প্রতি আবহাওয়াবিদরা আবারও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, আটলান্টিক সাগরে আরেকটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হচ্ছে। হ্যারিকেন অফেলিয়া নামের এ ঘূর্ণিঝড়টি আমেরিকায় আঘাত হানবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। যদি তা হয় তবে তা আমেরিকার জন্য আরেকটি আশঙ্কা সৃষ্টি করবে। তবে ক্যাটরিনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং নীতি পরিবর্তন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মানব বিপর্যয়রোধসহ অন্যান্য ঝুঁকি সহজেই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র কি সিদ্ধান্ত নিবে তাই দেখার বিষয়।



# ইন্টারনেট ফিল্টার কতটা জরুরি?

রুহিয়া আখতার



ইন্টারনেটের পূর্ণ বা নির্দিষ্ট সাইটের প্রতিই তরুণ-তরুণীদের অগ্রহ বেশি। এর ফলে তারগণের নৈতিক চরিত্র অবক্ষয় ঘটছে। এর প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে অভিভাবকদের সতর্ক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। ইন্টারনেট ফিল্টারিং ব্যবস্থা এ বিপর্যস্ত অবস্থাকে কিছুটা হলেও কমাতে পারে। বর্তমানে ইন্টারনেট নগ্নতা বন্ধের লক্ষ্যে মার্কিন কংগ্রেসে আলোচনা উঠেছে। আমাদের দেশেও এ নিয়ে ভাববাব্দ সমৃদ্ধ হয়েছে।

ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি জগতে জ্ঞান ও অপরিমিত বিনোদন ভাণ্ডার হলেও কোনো কোনো ওয়েবসাইট সব বয়সী ব্যবহারকারী, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে, যার ছবি ও তথ্য আশ্চর্যের মতো সমাজেও অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করতে সে দেশের অভিভাবকরা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়ে পড়েছেন। ইন্টারনেট থেকে এ ধরনের নগ্ন ও অশ্লীল ওয়েবসাইট বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় ও মার্জিত ওয়েবসাইট যে সফটওয়্যারের সাহায্যে বেছে নেয়া যায় তাকে সেন্সরওয়্যার বলা হয়। অনেকে আবার এ সেন্সরওয়্যারকে ছাঁকন বা ফিল্টার বলে থাকেন।

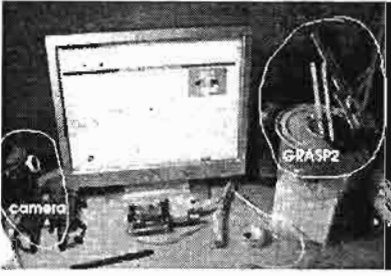
যেহেতু আমাদের দেশে দিন দিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে সেহেতু ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের সেন্সরশিপ নিয়ে আমাদেরকেও ভাবতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি সস্তা হওয়ায় সে

দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের দোকানীও এ বিষয়ে জ্ঞাত। ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত এ যাবতকালে যত আইন প্রণীত হয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছায়াকার স্ক্যানার দমন ও নিষ্কলসহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্টিন ইন্সট্রুমেন্ট মার্কিন সিনেট প্রণয়ন করে ফেলেছে। বর্তমানে ইন্টারনেট নগ্নতা বন্ধের লক্ষ্যে মার্কিন কংগ্রেসে আলোচনা উঠেছে।

আইন প্রণয়নকারীরা বলেছেন, যেসব লাইব্রেরি ও স্কুলের কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে সেগুলোতে অবশ্যই ফিল্টার কিংবা সেন্সরওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এ সেন্সরওয়্যার বা ফিল্টার অভ্যস্ত দামি। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এটা তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা এ ধরনের সফটওয়্যারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে যে, সেন্সরওয়্যার ব্যবহারে হিতে বিপরীত ঘটনা ঘটছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেন্সরশিপের মাধ্যমে কেউ একজন

ব্রেস্ট শব্দটি অপরিসীম শব্দ তালিকায় উল্লেখ করে রাখলে এর ফলে ব্রেস্ট ক্যান্সার নামের ওয়েবসাইটটি মূল ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে না বা ডাউনলোড হবে না। অথচ এ ব্রেস্ট ক্যান্সার সাইটটি ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় একটি ওয়েবসাইট। মনে হবে এ ঘটনাবলি পুরো উল্টোটিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটে দেখা যাচ্ছে। এজন্য সেন্সরওয়্যারের প্রতি লোকজন এখন আর খুব একটা আস্থা রাখতে পারছে না।

ইন্টারনেট বর্তমানে অফিস-আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি আর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ ছেড়ে সাধারণ ব্যবহারকারীর নিত্য ব্যবহার্য উপাদানের মতো ঘরের কোণে জায়গা দখল করে নিয়েছে। কম্পিউটার আছে এমন বাদায় দেখা যাচ্ছে যে, বাচ্চারা ভিডিও গেমস, টিভি, ভিসিপি বা ক্যাবল টিভির রঙিন মোহ তাগ করে কম্পিউটারভিত্তিক গেমস ও ইন্টারনেট বিনোদনের দিকে হাত বাড়িয়েছে। যেসব অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী বা টিনএজাররা অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে থাকে তারা অবশ্যই



কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল ওয়েবসাইটের দিকে স্বাভাবিক কারণেই ঝুঁকে পড়ছে। বিশেষ করে সম্প্রতি আমাদের দেশে কম্পিউটার ও এর আনুষঙ্গিক উপাদানের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাওয়ায় দিন দিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আর সঙ্গত কারণেই ব্যবহারকারী টিনএজারের দলও প্রতিনিয়ত ভারী হচ্ছে।

কিছুদিন আগে পরিচালিত একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটে সের্ব সম্পর্কিত শব্দ বেশি খুঁজে থাকে। এ ধরনের সাইটে তাদের বিচরণ সর্বাধিক। আমাদের দেশে পরিসংখ্যান চালালেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। এ ধরনের প্রবণতা থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করতে স্বাভাবিকভাবে অভিভাবকরা এমন ধরনের সফটওয়্যার খুঁজে থাকেন, যা ইন্টারনেট থেকে আপত্তিকর বা যৌনসংক্রান্ত সাইটগুলো বাদ দিয়ে শুধু বাচ্চাদের ব্যবহার উপযোগী

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের নাম দেখে এর অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আর ওয়েবসেপ্সর ওয়েবসাইটের নামগুলো স্ক্যান করে আপত্তিকর নামসমৃদ্ধ সাইটগুলো ফিল্টার করে থাকে। কিন্তু যদি কেউ সুন্দর কোনো ওয়েবসাইটের নামের আড়ালে কুরুচিপূর্ণ কোনো ছবি বা বক্তব্য সংযোজিত বা প্রবাহিত করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেসরওয়্যারের তেমন কোনো কিছু করার থাকে না।

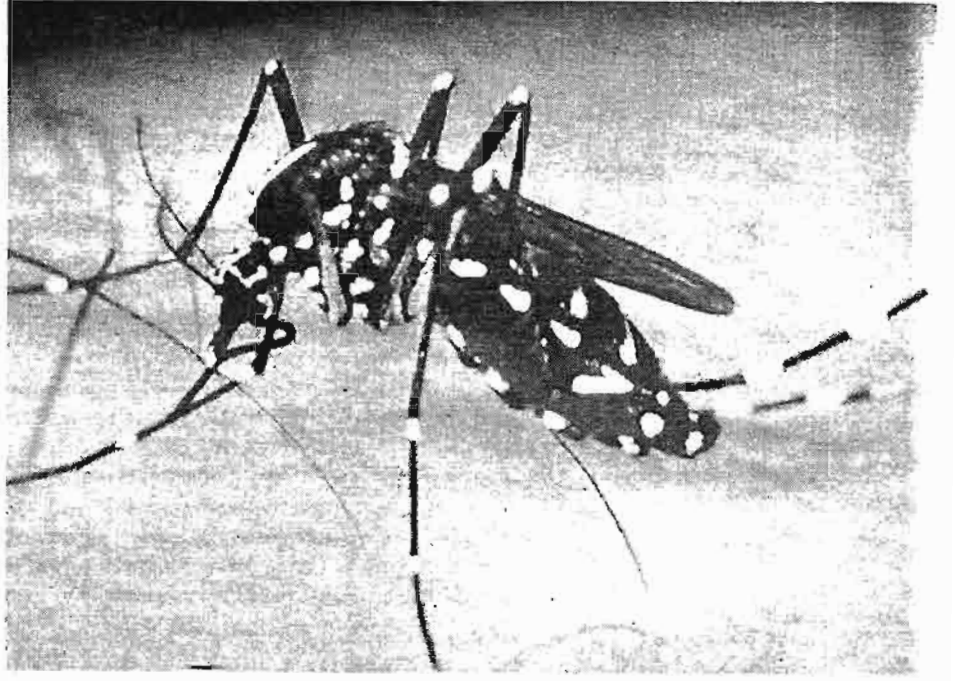
সাইটগুলো উন্মুক্ত রাখবে। এ হলো মোটামুটিভাবে সেপ্সরওয়্যারের আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ পর্যন্ত বাজারে যেসব সেপ্সরওয়্যার এসেছে সেগুলো হলো- সাইবার পেট্রোল, নেট নানী, সেওটি নেট ইত্যাদি। তবে এ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে তেমন কোনো উপকার হচ্ছে না বলে ব্যবহারকারীরা মন্তব্য করেছেন। তারা বলেছেন সেপ্সরওয়্যার হাজারো রকম আপত্তিকর ওয়েবসাইট থেকে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ওয়েবসাইট শনাক্ত করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেপ্সরওয়্যার কোনো অবস্থাতেই অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

আপত্তিকর ওয়েবসাইটের জনকদের অতি চালাকি বা ধূর্ততা সেপ্সরওয়্যারের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কোনো কোনো মহল মনে করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের নাম দেখে এর অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আর ওয়েবসেপ্সর ওয়েবসাইটের

নামগুলো স্ক্যান করে আপত্তিকর নামসমৃদ্ধ সাইটগুলো ফিল্টার করে থাকে। কিন্তু যদি কেউ সুন্দর কোনো ওয়েবসাইটের নামের আড়ালে কুরুচিপূর্ণ কোনো ছবি বা বক্তব্য সংযোজিত বা প্রবাহিত করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেপ্সরওয়্যারের তেমন কোনো কিছু করার থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এর উল্টো ঘটনাও দেখা গেছে। যেমন- ইয়াহু-তে কোনো আপত্তিকর শব্দ লিখে সার্চ করলে দেখা যাবে সুন্দর ও তথ্যমূলক কোনো প্রতিবেদন আমাদের চোখের সামনে ভেসে এসেছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে এ ধরনের বুটকামেলা নতুন কিছু নয়। ইন্টারনেটে দুই দুই লোকের বিচরণ যেমন অবাধ, ঠিক তেমনই এদেব প্রতিপক্ষরাও কম শক্তিশালী নন। আশা করা হচ্ছে, অতি শীঘ্রই সেপ্সরওয়্যার সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। আর তখনই সারা বিশ্বব্যাপী ৭৫ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কোনো তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াই নির্ভয়ে তাদের কম্পিউটার বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে পারবে।



এডিস মশার  
বিস্তার রোধ  
ছাড়াও  
রোগাক্রান্ত  
হওয়ার পর  
সময়োপযোগী  
চিকিৎসায়  
রোগসংক্রান্ত  
জটিলতা থেকে  
মুক্তি পাওয়া  
সম্ভব।



# ডেঙ্গু থেকে সাবধান

হারুন-অর-রশিদ সিদ্দিকী

**ডে**ঙ্গু মশাবাহিত একটি রোগ। এটি ভাইরাসজনিত একটি জ্বর, যা ডেঙ্গু ভাইরাস দিয়ে হয়। মশার কামড়ে এ ভাইরাস একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে ছড়ায়। তবে মশা কামড়ালেই ডেঙ্গুজ্বর হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। মশা অনেক রকম আছে, সব মশার কামড়েই ডেঙ্গু হয় না। শুধু এডিস ইজিপটাই বা এডিস এলরোপিকটাস জাতের স্ত্রী মশার কামড়ে এ রোগ হয়। যদি কোনো এসিড মশা ডেঙ্গুজ্বরের কোনো রোগীকে কামড়ায়, তারপর ঐ মশাটিই যদি সুস্থ কোনো লোককে কামড়ায় তবেই সে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হবে। ইদানীং অবশ্য কিউলেক্স মশা দিয়েও এ রোগ হয় বলে কথা উঠেছে, তবে তা এখনো নিশ্চিত হয়নি।

ডেঙ্গুজ্বর আমাদের দেশে আগেও ছিল, তবে সেটা এত ব্যাপক আকারে না থাকায় এবং নিশ্চিত না হওয়ায় প্রকাশ পায়নি। সাধারণ ভাইরাস জ্বর বলেই এটাকে ধরে নেয়া হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে। আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতেও এ জ্বরের প্রকোপ রয়েছে। এতদিন ধারণা করা হতো আমাদের দেশে ডেঙ্গুজ্বর শুধু বর্ষা মৌসুমেই হয়। এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সারা বছর জুড়েই কম-বেশি ডেঙ্গুজ্বর হচ্ছে। মশার কামড়ে শুধু ডেঙ্গুজ্বরই নয়, আরো বেশ কয়েকটি রোগ ছড়ায়। যেমন- ম্যালেরিয়া,

ফাইলেরিয়া ইত্যাদি। ম্যালেরিয়া জ্বরেও অনেকের মৃত্যু ঘটে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার 'সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া' অত্যন্ত ভয়াবহ। ডেঙ্গুজ্বর জটিল আকার ধারণ করলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে—এ কথা ঠিক। তবে জ্বর হলেই তা ডেঙ্গুজ্বর, ডেঙ্গু হলেই মারাত্মক কিছু, ডেঙ্গুজ্বর হলেই রক্ত দিতে হবে আর রক্ত মানেই মৃত্যুর হাতছানি—এ ধরনের ধারণা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। কারণ জ্বর অনেক কারণেই হয়ে থাকে এবং অনেক ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারাই জ্বর হয়। তার মধ্যে ডেঙ্গুজ্বর এক ধরনের জ্বর। আর অধিকাংশ ডেঙ্গুজ্বরই আপনা-আপনিই ভালো হয়ে যায়। ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরও কম মারাত্মক নয়।

বৃষ্টির সময়টি অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুমাস কোনো মতো পার হলেই ডেঙ্গুর সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে বলে এপিডেমিওলজিস্ট বা রোগতত্ত্ববিদরা মনে করে থাকেন। কিন্তু এবারের বৃষ্টি দীর্ঘায়িত হয়ে ভাদ্র মাসেও অব্যাহত ধারায় ঝরেছে। ফলে চৌবাচ্চা, প্রাস্টিক ক্যান, ডাবের খোশা, গর্ত, নর্দমায় পানি জমে থেকে ডেঙ্গু মশার বিস্তারে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ডেঙ্গুর ভয় আর করব না—এ রকমভাবে চলতে গিয়েই এখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডেঙ্গু রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। ডেঙ্গু রোগের কোনো ভ্যাকসিন নেই।

তাই এডিস মশার বিস্তার প্রতিরোধ ভিন্ন এ রোগ থেকে মুক্তির উপায় নেই।

রোগতত্ত্ববিদদের মতে এডিস মশার বিস্তার রোধ ছাড়াও রোগাক্রান্ত হওয়ার পর সময়োপযোগী চিকিৎসায় রোগসংক্রান্ত জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ইতোমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি, নগরীর বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন এসব জায়গায় অসাবধানতাবশত পানি জমে থাকার কারণে ডেঙ্গুজ্বর অধিক হারে দেখা দিয়েছে। এছাড়া রাজধানীর কমলাপুরেও ডেঙ্গুজ্বরাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। ডেঙ্গু ছোঁয়াচে রোগ নয়, তবে কোন এলাকায় ডেঙ্গুজ্বর বেশি হচ্ছে বা রোগীরা চিকিৎসা নিতে আসে তা জানা থাকলে, সে এলাকাগুলোতে ভ্রমণ এড়িয়ে চললেও আপনি রোগটি থেকে দূরে থাকতে পারেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রফিকউদ্দীন এ প্রসঙ্গে বলেন, ডেঙ্গুজ্বর নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে ঘরের চিকিৎসা হলো খাবার স্যালাইনসহ তরল জাতীয় খাবার পান করা। তবে কোনো রোগীর রক্তক্ষরণ হওয়া অথবা চোখ লাল হয়ে যাওয়া অথবা রক্তের প্রোটিনেট আধিক্য দেখা দিলে তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে ডেঙ্গু জ্বরে কোনো ধরনের জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা

থাকে না। রোগ ব্যবস্থাপনা এবং রোগ নির্মাণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আপনার এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন।

#### ডেঙ্গুর লক্ষণ কি?

গায়ে জ্বর, শরীর ব্যথা, র্যাশ বা শরীরে লালচে ছোট ছোট হামের মতো দাগ- এসবই শুধু ডেঙ্গু রোগে দেখা যায়, তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন ভাইরাস রোগ যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা, হেপাটাইটিস, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফাস রোগ, ম্যালেরিয়ার প্রাথমিক স্তরে, টাইফয়েড রোগ এসব ক্ষেত্রেও শরীরে ব্যথা ও শরীরে র্যাশ দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ভাইরাস রোগ সংক্রমণের পর আপনাপনি ভালো হয় আবার সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরে রোগীর শরীরে এবং মাথায় ব্যথা অনুভব করলেও কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সমস্যা হলো ডেঙ্গু হেমোরাজিক জ্বর এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রম নিয়ে। এক্ষেত্রে সামান্যতম অসতর্কতা আপনার জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

#### ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে যা করতে হবে

\* প্রথমেই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মশারির ব্যবস্থা করবেন। যেন আক্রান্ত ব্যক্তিকে একাধিকবার ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণু বহনকারী মশা কামড়াতে না পারে অথবা তার শরীর থেকে রক্ত মশার মাধ্যমে অন্যের শরীরে প্রবেশ না করে।  
\* আক্রান্ত রোগীর তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে শুধু প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেয়া।  
\* বাসায় থাকাকালীন প্রচুর পরিমাণে পানি অথবা ফলের রস অথবা তরল জাতীয় খাবার খাওয়া।  
\* জ্বর ২-৩ দিন হলেই সম্ভাব্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করা।

#### ডেঙ্গু হেমোরাজিক জ্বর এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রমের ক্ষেত্রে কী করবেন

\* রোগী চেতনাশূন্য না হলে, রোগী যতক্ষণ ঘরে আছেন তাকে খাবার স্যালাইন খেতে দেয়া।  
\* জ্বরের জন্য শুধু প্যারাসিটামল সেবনের পরামর্শ দেয়া।  
\* রক্তচাপ হ্রাস পেলে তৎক্ষণাৎ রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা এবং পথিমধ্যে শিরাপথে স্যালাইনের (ডিএনএস) ব্যবস্থা করা।  
\* শরীরে চাকা চাকা দাগ বা রক্তক্ষরণ দেখা দিলে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা এবং রোগীর রক্তের গ্রুপ ও ক্রসম্যাচিং আগামভিত্তিতে করে রাখা।  
ডেঙ্গুজ্বরে যা করবেন না  
\* রোগীকে কোনো ধরনের ক্লান্তিময় কাজ করতে দেবেন না।  
\* রোগীকে প্যারাসিটামল ব্যতীত এমনকি অন্য কোনো ব্যথার ওষুধও দেবেন না।  
\* রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ দেবেন না।  
\* রোগীর শরীরের ফুইড বা স্যালাইন ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী হঠাৎ করে বাড়িয়ে বা কমিয়ে আনবেন না।

\* ডেঙ্গুজ্বরের অ্যান্টিবডি পরীক্ষা প্রথম ১৫৫ এক সপ্তাহ আগে এবং ১৫৫ দুই সপ্তাহ আগে পরীক্ষা করবেন না।  
\* রোগীর নাকে মল ঢুকিয়ে জমট রক্ত পরিষ্কার করা অথবা ঠাণ্ডা পানি প্রবেশ করানো ইত্যাদি করা যাবে না।  
\* ডেঙ্গু হেমোরাজিক জ্বরের ক্ষেত্রে রোগীকে মাংসপেশীতে ভো বটেই এমনকি ডায়াবেটিস রোগীর জন্য চামড়ার নিচেও ইনসুলিন নেয়া যাবে না।  
\* চিকিৎসার জন্য অজ্ঞতাভাবশত হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবন করবেন না।

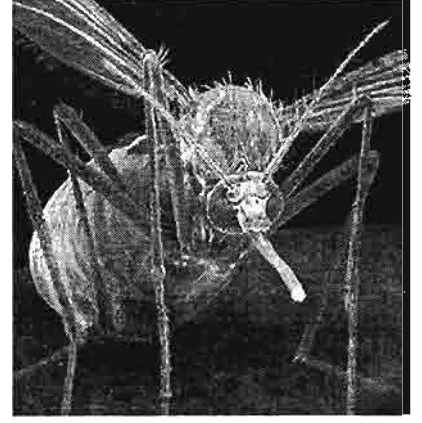
#### ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

\* বাস 'অথব' বাগানের টবে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করুন।  
\* বর্ষাকালে দিনের বেলা ফুল হাতা শার্ট বা কমিজ এবং মোজা পরে থাকুন।  
\* মশার কয়েল ব্যবহারে অনুবিধা হলে মসকিউটো রিপিলেন্ট ব্যবহার করুন।  
\* বাড়িতে নেটের ব্যবস্থা করুন।  
\* বাড়ির আশপাশের ড্রেনে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করুন অথবা ডিডিটিয়ুজ পানি স্প্রে করুন।  
\* কোনো এলাকায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ দেখা দিলে সে এলাকার বাসিন্দাদের ঘরে নেট ছাড়াও সর্বক্ষণ মশারি ব্যবহার করা উচিত।  
\* সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মশক নিধন অভিযান ডেঙ্গু রোগ নিরোধে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

#### জেনে নিন কোন কোন হাসপাতালে ডেঙ্গুজ্বরের চিকিৎসা প্রদান করা হয়

\* ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মেডিসিন ওয়ার্ড।  
\* সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড, মেডিসিন বিভাগ।  
\* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিসিন বিভাগ।  
\* সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, মেডিসিন বিভাগ।  
\* হলি ফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ইকটন, ঢাকা।  
\* সেন্ট্রাল হাসপিটাল, গ্রিন রোড, ঢাকা।  
\* মনোয়ারা হাসপাতাল, সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা।  
\* ন্যাশনাল হাসপাতাল, জনসন রোড, ঢাকা।

আক্রান্ত এডিস মশা কামড়ানোর এক সপ্তাহের মধ্যে সাধারণত ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ দেখা দেয়। সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরে উচ্চ তাপমাত্রা, মাথায়-চোখে-মাংসপেশীতে ও হাড়ে তীব্র ব্যথা হতে পারে, যা কয়েকদিন পরে এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। ডেঙ্গুজ্বরের জটিলতা জ্বর চলে যাবার পরেই সাধারণত বেশি হয়। আর তাই জ্বর চলে গেলেও রোগীকে আশঙ্কামুক্ত হওয়ার জন্য অন্তত ৭২ ঘণ্টা বিশ্রামে থাকতে হবে। আর জটিল ডেঙ্গু হিমোরাজিক জ্বরের বেলায় এসব লক্ষণের সাথে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে। যেমন- ত্বকের নিচে, মাটি দিয়ে, নাক দিয়ে এবং বমি বা পায়খানার সাথে রক্তক্ষরণ বেশি হলে বা বিশেষ কোন প্রয়োজনে



ডেঙ্গুজ্বরের জটিলতা জ্বর চলে যাবার পরেই সাধারণত বেশি হয়। আর তাই জ্বর চলে গেলেও রোগীকে আশঙ্কামুক্ত হওয়ার জন্য অন্তত ৭২ ঘণ্টা বিশ্রামে থাকতে হবে।

কোনো কোনো রোগীকে আইভি স্যালাইন, রক্ত বা রক্তের প্রোটিন দেয়ার দরকার হতে পারে। ডেঙ্গুজ্বরে মৃত্যুহার খুব বেশি না হলেও কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ বলে রোগীর সেবা-যত্ন ও চিকিৎসা সব সময় একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সাধারণত ডেঙ্গুজ্বরে রোগীকে বাসায় রেখে চিকিৎসা করলেও চলে। রোগীর সমস্যা অনুযায়ী চিকিৎসা করলেই রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে জটিলতা দেখা দিলে ঝুঁকি না নিয়ে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে চিকিৎসা করানোই নিরাপদ। যাতে করে রোগীর যখন যা প্রয়োজন তা করা যায়। ডেঙ্গুজ্বরে রোগীর খাওয়া-দাওয়ায় কোনো প্রকার বাধা-বিচার নেই। বরং শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পানি, অন্যান্য তরল ও স্বাভাবিক খাবার বেশি বেশি করে খেতে হবে। দুটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো ১. ডেঙ্গুজ্বরে ব্যথা ও তাপমাত্রা কমতে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। ২. ডেঙ্গুজ্বরের রোগীকে অবশ্যই সারা দিনরাত মশারির নিচে রাখতে হবে। কারণ আক্রান্ত রোগীকে মশায় কামড়ানোর ঐ মশা যাকে কামড়াতে তারই ডেঙ্গুজ্বর হবে।

বিজ্ঞানীদের অবিরাম চেষ্টার পরও ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে আজ পর্যন্ত নিশ্চিত কার্যকরী কোনো ভ্যাকসিন বা টিকা বের হয়নি। ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণু ভাইরাস হওয়াতে এর কোনো সরাসরি সুনির্দিষ্ট ওষুধও নেই। কাজেই ডেঙ্গুজ্বর যাতে না হয়, সেদিকেই সবার দৃষ্টি দেয়া দরকার। যার জন্য প্রয়োজন ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস মশাকে ঘরের ভেতর ও বাইরে থেকে সমূলে ধ্বংস করা। আর সচেতনতাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জরুরি। তাই আসুন, আমরা সবাই নিজ ঘর থেকেই ডেঙ্গু প্রতিরোধ শুরু করি।





## দ্বিতীয় মৃত্যু

মাস ছয়েক আগের কথা। কোনো এক কারণে জামালপুর সদর (সরকারি) হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা বেশ বড়সড় ভিড় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। হাসপাতালের বারান্দায় এক মহিলার আকাশ কাঁপানো আর্ত চিৎকার এবং অভিসম্পাতে

ধ্বনিত হচ্ছিল গোটা হাসপাতালে। উৎসূকা হয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। তারপর যা জানলাম তা হচ্ছে— মহিলার বাড়ি জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার একটি গ্রামে। হঠাৎ তার বার বছরের ছোট ছেলেটির ডায়রিয়া হয় এবং তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। মহিলা তার বাচ্চটিকে হাসপাতালে ভর্তি করলে কিছুক্ষণ পড় কর্তব্যরত ডাক্তার বাচ্চটিকে মৃত ঘোষণা করে। কিন্তু নাড়ি স্পন্দন তখনো খুবই স্বাভাবিক স্পন্দিত হচ্ছিল। মহিলা বাচ্চটিকে বাড়ি নিয়ে যায়।

বাচ্চটি উঠানে পাটির ওপর রাখা বস্তায় কয়েকবার হাত পা ছোঁড়ে এবং কান্নামতো শব্দ করে জ্ঞান হারায়। উৎস্রাণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য আনা হলে ডাক্তার দ্বিতীয়বারের মতো তাকে মৃত ঘোষণা করে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সদর হাসপাতালের ডাক্তার যদি একই রোগীকে দুবার মৃত ঘোষণা করে, সেক্ষেত্রে তাদের ওপর কতটুকু আস্থা রাখা যায়!

আল-মামুন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বা.কৃ.বি।

## ভুল চিকিৎসা

আমাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক মহিলার অ্যাপেন্ডিসাইটের অপারেশন করা হবে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন, যথাসময় ও তারিখে অপারেশন করা হলো। কিন্তু অ্যাপেন্ডিসাইটের নাড়ি অপারেশন করা হয়নি, করা হয়েছে মলত্যাগের নাড়ি। অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছার পর প্রথমে খুলনা মেডিকলে এবং পরে ঢাকা মেডিকলে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে তার জীবন চলছে। এটা কি অজ্ঞতা নাকি অবহেলা। যা হোক, এ রকম দুরবস্থা যেন আর কারো না হয়। পরিশেষে ডাক্তার স্যারদের বলছি, ডাক্তারের মতো মহৎ পেশায় সবাই আসতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে ওটিকয়েক মানুষই এ সোনার হরিণটা পেয়ে থাকে। তাই আপনাদের মহানুভবতা ও সহমর্মিতার পথপানে চেয়ে আছে ১৪ কোটি মানুষ। আপনাদের যথার্থ যত্ন ও ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ করুন আপনার মহানুভবতা।

হুলহুল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

## চিকিৎসা বিভ্রমণা

আমার মায়ের মুখ থেকে শোনা ১৯৯৭ সালের ঘটনা। আমার বয়স তখন মাত্র নয় মাস। বাবা কাটলা হাটে গিয়েছে কিছু বাজার করার জন্য। বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। তবে বিকল্প পথ দিয়ে গেলে দূরত্ব একটু কম হয়। বাবা বাজার করে ঠিক সন্ধ্যার পরপরই ফেরত আসছিল বিকল্প পথ দিয়ে অর্থাৎ ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে। ধানক্ষেতের আইসে বিধাক্ত সাপ থাকটা যেমন স্বাভাবিক তেমনি কামড় দেয়াটাও স্বাভাবিক। যথারীতি তাই ঘটল। বাড়ি এসে বলল কি যেন পায়ে কামড় দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরই বাবা চিৎকার করে বলছে আমার পা জ্বলে যাচ্ছে। গ্রামের লোকেরা বলছে সাপে কেটেছে, বললই ওকা ডেকে আনল। রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত

ওকা তার এবং গুরুত্ব সব মন্ত্র পাঠ করেও বাবাকে একটু আরাম দিতে পারেনি। ইতোমধ্যে বাবার করণ অবস্থা। বড় ভাই পার্শ্বের গ্রাম থেকে একটি হাতুড়ে ডাক্তার ডেকে এনেছিল। নাম তার বন্ধুরা, সবাই ডাক্তার বন্ধুর বলে। বাবাকে দেখেই বলল, সাপে কাটেনি। ইনজেকশন দিলেই সবঠিক হয়ে যাবে। যেই কথা সে কাজ। ইনজেকশন দেয়া মাত্র ইনজেকশনের শক্তি সবাই বুঝতে পারল। অর্থাৎ ২ মিনিটের মধ্যে বাবা সাপে কাটা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেও মরণের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। আমি আজ বড় হয়েছি। বাবাকে কখনো দেখিনি। দেখেছি বন্ধুর নম্র ফকর ডাক্তারকে।

ইবনে মুরাদ, বেনুপুর

কাটলাহাট, বিরামপুর, দিনাজপুর।

## এ কেমন বিভ্রমণা

আমার বন্ধু সাঈদ গত মাসে কুমিল্লায় অবস্থিত একটি হাসপাতালে যায় তার সমস্যা সমাধানের জন্য। সেখানে সে চর্ম ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শের জন্য যায়। সে গিয়ে দেখে ডাক্তার একজন মহিলা। আর ডাক্তার তাকে বললেন 'কোথায় তোমার সমস্যা দেখাও দেখি। তার সমস্যা ছিল তার পায়ের উর্ধ্বাংশে এবং নাজীর নিচে। সে একজন যুবক হয়ে কীভাবে তা দেখায়। তখন সে তার সমস্যার কথা না বলে চলে আসে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার কি করা উচিত তা আমি জানি না। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য কর্তৃপক্ষকে পুরুষদের জন্য পুরুষ ডাক্তার এবং মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারের ব্যবস্থা করা উচিত।

ইমরুল হাসান রাসেল

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ।

## কম্পাউন্ডার

চিকিৎসা বিভ্রমণায় জীবনে বেশি পড়তে হয়নি। তবে একবারের কথা আমাকে এখনো হাসায়।

সেবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর পাঁচ বন্ধু মিলে চলে গেলাম অন্য এক বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে। গ্রামটি ছিল অজপাড়া গাঁ বলতে যা বোঝায়, তাই। আমরা কয়েক দিন খুব হৈ চৈ করে কাটলাম। কয়েকদিনের এরকম অনিয়ম করাতে আমার পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। শুধু বাথরুমে যাই আর আসি। বন্ধুর কথামতো গেলাম ডাক্তারের কাছে। বন্ধুর কাজ থাকায় ঐ গ্রামের বন্ধুটি যেতে পারেনি। আমি তো আর ডাক্তার চিনি না। চেয়ারে যে লোক বসেছিল তাকেই সমস্যার কথা বললাম। তিনি, ওষুধ দিলেন। কিন্তু সারাদিনে কোনো উপকার না পাওয়াতে বন্ধুকে সাথে নিয়ে পরের দিন আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি ডাক্তার অন্য একজন। গতকালের ব্যক্তিটি তার সহকারী অর্থাৎ কম্পাউন্ডার।

আলোক আচার্য্য (অমি)

রাধানগর, যুগীতলা, পাবনা।



## ভূয়া ডাক্তার

লম্বা পাতলা করে প্রত্যেক দিন নিজ ফার্মে বসেন এক ডাক্তার। একদিন আছাড় খেতে পায়ে ব্যথা পেয়েছিলাম। তো ডাক্তারের ক যাচ্ছি হঠাৎ করেই সাগর ভাই নামের বড় না বলে উঠল। আমি কেন? জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঐ ডাক্তার একজন ভূয়া ডাক্তার সাগর ভাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই ভাই বলল, 'আমার পাতলা পায়খানা হওয়া ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। শালা এমন দিয়েছে যে পুরো দেড় দিন পর আমাকে পায়খানা করতে হয়েছে, তবুও কষ্টে।'

মোঃ রওশন জাদীদ রাসেল

সেউজগাড়ী, বগুড়া।



## ঘাতক হাতুড়ে ডাক্তার

ক্লাস এইটে তখন আমি। আমাদের পাশের বিল্ডিংয়ে থাকত এক ভদ্রমহিলা। তার এ নম্বর জগতে শুধু একটি মেয়ে, মেয়েটি আমার ক্লাসমেট। দুজনই এক সাথে স্কুলে আসা যাওয়া করি। অর্থাৎ সে আমার girl friend। ভদ্রমহিলাটিকে আমি আন্টি বলে ডাকতাম। আমাকে আন্টি খুব আদর করত। একদিন দুজনে প্রতিদিনের মতো স্কুল শেষে আন্টির বাড়িতে যাই। গিয়ে দেখি আন্টি বিছানার মধ্যে কোলবালিশ চেপে কেমন যেন ছুটফুট করছে। তার একটা মারাত্মক রোগ ছিল বলে আমি স্থির থাকতে না পেরে দুজনেই দৌড়ে গিয়ে আন্টির মাথায় হাত রেখে তার এ অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলাম। আন্টির মেয়েটি আন্টির পাশে বসে ফুঁফুঁয়ে ফুঁফুঁয়ে কাঁদতে লাগল। তার মারাত্মক রোগের কথা জানতে পেরে ফোন করলাম ভাড়াভাড়ি আঙ্কেলকে এবং ডাক্তারকে। আঙ্কেল অফিস থেকে আসতে দেরী হলেও ডাক্তার কিন্তু এসে হাজির। ডাক্তার তার রোগের বর্ণনা শুনে কিছু পাওয়ারফুল ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তার চলে গেলে আন্টিকে ওষুধ খাওয়ানোর কিছুক্ষণপরই ধীরে ধীরে আমার সেই প্রিয় আন্টিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। শুধু সেই কুখ্যাত ডাক্তারের কারণে অল্পক্ষণে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল একটি কপাল পোড়া মেয়ের প্রিয় মা। মুছে গেল পৃথিবী থেকে আমার সব আদর। চলে গেল একটি মানুষের জীবনসঙ্গী। ধ্বংস হলো একটি জাতি। শুধু ডাক্তার নামের কলঙ্ক হাতুড়ে ডাক্তারের কারণে। আমার সেই বান্ধবী তার মায়ের আকাল মৃত্যুতে আমাকে জড়িয়ে ধরে হো হো করে কেঁদে উঠল। আমাদের আদরের একটি দরজা বন্ধ হওয়াতে আজও সেই স্মৃতি মনে পড়লে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

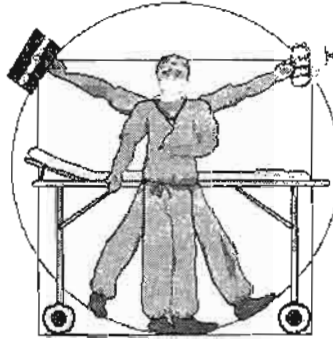
মোঃ ফরিদুল ইসলাম (আসিফ)  
চকবাজার বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

## ডাক্তারন ট্যাবলেট

আমার এসএসসি রেজাল্টের পর শহরে আসছিলাম কলেজে ভর্তির খোঁজ নিতে। আমার সাথে ছিলেন আমার সেজ ভাইয়া। আসার

সময় পথে আমরা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই। আমরা টেক্সিতে ছিলাম। একটি পিকআপ আমাদের টেক্সিকে পাশ দিয়ে ধাক্কা দেয় এবং টেক্সিটা উল্টে যায়। আমার সেজ ভাইয়া গুরুতর আহত হন। আমিও একটু আঘাত পেলাম এবং কেটে গেল একটি জায়গায়। ভাইয়াকে যখন হাসপাতালে নেয়া হলো তখন ডাক্তার তাকে ব্যথানাশক ইনজেকশন দিলেন। অন্য একজন যাত্রীও ব্যথার কারণে ইনজেকশন নিলেন। আমি যখন বললাম যে, আমার পিঠে একটু চিড়ে গেছে এবং ব্যথা করছে। তখন ডাক্তার সাহেব বললেন ইনজেকশন নিতে। শেষোক্ত আমি পিছে পা বাড়লাম এবং ডাক্তারের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে জরুরি ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে গেলাম। পরে অবশ্য ৪টা (ডাক্তারন ট্যাবলেট) আমার ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে।

মুহাম্মদ আরাফাতুল আলম (নয়ন)  
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।



## চিকিৎসা বিভ্রাট

কর্মক্ষেত্র জকিগঞ্জ, সিলেট। চাকরি জীবনের দুবছরের মাথায় অনুখে পড়লাম। অবিরাম জ্বর। জ্বরের উঠানমা বেশ আবার কাঁপনিও আছে। রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু না পাওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা শুরু করলেন। আত্মীয়হীন পরিবেশে লজ্জি বাড়ির মানুষেরা ঐ সময়ে যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন তা ভোলার নয়। গ্রামের এক লোক এক কবিরাজকে নিয়ে এলেন। কবিরাজ মন্ত্র পড়লেন, গায়ে মাথায় অনেক ফুঁ দিলেন। আর

গৃহকর্তীকে আমার মাথায় বার বার জল দেয়ার পরামর্শ দিলেন। হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু কবিরাজ আনায়নকারী ব্যক্তির আন্তরিকতায় চোখে জল এলো। এ পরামর্শের ফলে সংকোচ কাটিয়ে গৃহকর্তীর ভূমিকা হয়েছিল বড় বোনের ন্যায়। এর ৩/৪ দিনের মধ্যেই জ্বর কমে এলো। জ্বর কমলে কি হবে দুর্বলতার কারণে হাঁটতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে এক সহকর্মীর সহায়তায় কুমিল্লা পৌছলাম। এখানে এক নামকরা ডাক্তার শেষে রোগ নির্ণয় করলেন টাইফয়েড হিসেবে। চল টাইফয়েডের চিকিৎসা। ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে : একদিকে শরীর কাঁচামো হলো দুর্বল, অন্যদিকে বেশ কিছুদিন ছুটি কাটাতে বাধ্য হওয়ায় চাকরিতে একমাত্র দাগটি লেগে গেল সারা জীবনের মতো।

দেবশীষ দত্ত  
বাগানবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, কুমিল্লা।

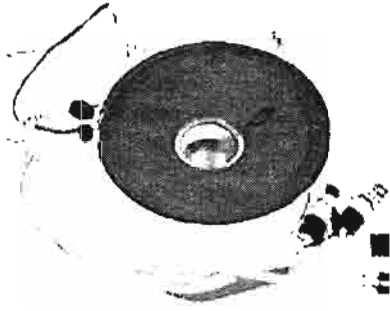
## লালমোহন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

লালমোহন থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর অর্থলিপ্সু এক ডাক্তার। সেন্নিন তার বাসার পাশে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সুবাদে তার বাসায় গেলাম। সেন্নিন কয়েকজন রোগী গিয়েছিল, যাদের অবস্থা একটু নিম্নমানের। যা দেখলাম, বাচ্চাছেলের মতো নানা রকম বাচনভঙ্গির মাধ্যমে ডাক্তার শুধু টাকা চাইছিলেন। বৃদ্ধ লোকটি যতই কাকুতি-মিনতি করলেন সবই ছিল নিষ্ফল আবেদন। বৃদ্ধ দেখেছি হসপিটাল অফিস টাইমে তিনি টাকার বিনিময়ে প্রেসক্রিপশন লিখেন আর হসপিটালস্ট্রিপে খসখস করে কিছু লিখে দেন, যা নিতান্তই অবহেলা আর দুঃখজনক। স্প্রিধারী লোকেরা গরিব হলেও তো তারা মানুষ। পয়সার অভাবে ব্যক্তিগত প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে নিতে পারে না এই তো ব্যবধান। দুটি কীর্তির কথা তুললাম। তাকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে, সবাই আমার রোগী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ব্যবধান নেই। জাতির অর্পিত দায়িত্বের সঠিক ব্যবহার আমাকে করতেই হবে।

নাইমো সাজ্জাদ  
লালমোহন কামিল মদ্রাসা, লালমোহন।

স	দ	স	কু	প	ন	বিজ্ঞান প্রজন্ম
নাম : .....						ছবি
ঠিকানা : .....						
.....						
.....						
.....						
শখ : ..... পেশা : .....						
বয়স : ..... ফোন : .....						
ই-মেইল : .....						
লেখা ও কুপন পাঠানোর ঠিকানা : বিজ্ঞান প্রজন্ম, মালিক সায়ম ওয়ার্ড, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (তৃতীয় তলা), বাগদাওর, ঢাকা-১১০০						





# আসছে ইলেক্ট্রনিক বোমা

হীরক চৌধুরী

মিডিয়ার যুগে আমরা বাস করছি। এখন সবকিছুই টিভির পর্দায় চলে আসে। তাই যুদ্ধ লাগলে সেটার ভয়াবহতা মিডিয়ার কাছে এক নম্বর খবর হয়ে যায়। যুদ্ধে যে যত মানুষ মারে, সবাই তার বিপক্ষে চলে যায়। তাই নিখুঁত অস্ত্র সেটাকেই বলা যাবে, যেটা শত্রুপক্ষকে তার ঘরেই আটকে রাখবে কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হবে না। এ ধরনের অস্ত্রের কাজ হবে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক সিস্টেম অকেজো করে দেয়া, পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করা, শত্রুপক্ষের অসংখ্য কম্পিউটার এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি পুরোপুরি অকেজো করা। এটা করার পর শত্রুপক্ষের লোকজনের চুল পরিমাণ ক্ষতি হবে না, বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাটও ঠিক থাকবে।

এ ধরনের বোমা বানানো কি সম্ভব? বানানো সম্ভব নয়, বরং বলা উচিত বানানো গেছে। এ নতুন অস্ত্র বা বোমার নাম হাই-পাওয়ার মাইক্রোওয়েভ বা (HPM)। নাম শুনলে বোঝা যাচ্ছে অস্ত্রটার কাজ কী। এ বোমা এমন এক ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ-এর তীব্র বিকিরণ ঘটায়, যার ফলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ‘মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড’ (Micro-wave Frequency band)। এর ক্ষমতা হবে কয়েক শ মেগাহার্টজ থেকে কয়েক শ গিগাহার্টজ, যা ইলেক্ট্রিক সার্কিট ড্যামেজ করতে যথেষ্ট।

এ অস্ত্র এমন পরিমাণ কারেন্ট ছুঁড়াবে, যাতে ইলেক্ট্রিক সার্কিট গলে যাবে। কম ক্ষমতাসম্পন্ন

বোমার বিস্ফোরণের ফলে আইসি অকেজো করে দেবে, ফলে যার ভেতর এ আইসি আছে সেটা অকেজো হয়ে যাবে। এ ধরনের বিস্ফোরণের মাঝে মানুষ পড়ে গেলে, তারা সেটা বুঝতেই পারবে না। তবে মিছিলের মানুষকে ছত্রভঙ্গ করতে এক ধরনের মাইক্রোওয়েভ অস্ত্র বানানোর কাজ চলছে।

এ অস্ত্র নিয়ে কাজ চলছে খুব গোপনে। ইরাক যুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে গুজব উঠেছিল। কিন্তু মার্কিন সামরিক বাহিনী সেটা অস্বীকার করেছে। তবে একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত, এ ধরনের অস্ত্র বানানোর উৎস পাওয়া গেছে। দিনের পর দিন এর উন্নতি হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ অস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধের চেহারা পাল্টে দেবে। আর এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে মার্কিন সেনাবাহিনী। তবে ইরাক যুদ্ধে যেসব নতুন অস্ত্র প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে, তার ভেতর ই-বোমাও ছিল।

সামরিক দিক থেকে এ অস্ত্রকে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি উইপনও বলা হয়। এ বোমায় রয়েছে অনেক সুবিধা। বিস্ফোরণের শব্দওয়েভ-এর গতি আলোর গতির সমান। যে কোনো জায়গা থেকে এটা নিক্ষেপ করা যায়। গ্রাডিটির এবং আবহাওয়ার কোনো প্রভাব থাকবে না এ বোমার ওপর।

এ বোমা দুই ধরনের- এক, আল্ট্রাওয়াইডব্যান্ড এবং দুই, ন্যারোব্যান্ড। প্রথমটাকে তুলনা করা যেতে পারে ফ্লাশলাইটের সাথে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে লেজারের মতো।

প্রথম ধরনের বোমা ব্যবহার করা হবে বিশাল এলাকা জুড়ে কিন্তু এর ক্ষমতা থাকবে কম (টেন জুলস পার পালস)। এ বোমার বিস্ফোরণের ফলে কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে বোমার রেঞ্জের ভেতর অরক্ষিত সব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি অকেজো বা ধ্বংস করে দেবে। বোমার ক্ষমতা নির্ভর করবে লক্ষ্যবস্তু থেকে বোমাটা কতদূরে আছে কিংবা কত উঁচু থেকে বোমাটা ফেলা হবে, তার ওপর। দ্বিতীয় ধরনের বোমাটা ব্যবহার করা হবে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যবস্তুর জন্য। ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা থেকে বের হবে একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি (ক্ষমতা কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার কিলো জুলস পার পালস)। এটা একবার ব্যবহার করা হতে পারে আবার কয়েক শতবার ব্যবহার করা হতে পারে। মনে করা যাক, শত্রুপক্ষের একটা হাসপাতালের ওপর তৈরি করা হয়েছে কমান্ড এবং কন্ট্রোল সেন্টার। হাসপাতালের আশেপাশে প্রচুর মানুষ বাস করে। এখন সাধারণ বোমা ব্যবহার করলে অসংখ্য মানুষ মারা যাবে আর মিডিয়াতে খবরটা চলে যাবে দ্রুত। ফলে যে এ কাজটা করবে তার জনপ্রিয়তা কমবে।

এখন দরকার ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা। এখন এ কন্ট্রোল সেন্টারকে অকেজো করতে হলে ই-বোমা ব্যবহার করা হবে। এর ফলে কোনো মানুষ এবং বাড়িঘরের ক্ষতি হবে না। কারণ বোমাটা ফাটবে আকাশে। ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা

তৈরি করাটা বেশ জটিল। মার্কিন সেনাবাহিনী এটার ওপর জোর দিয়েছে।

ই-বোমা নানাভাবে ব্যবহার করা যাবে। ক্রুজ মিসাইলের মতো ছোড়া যাবে। আকাশ থেকে পাইলট-বিহীন বিমান থেকে ফেলা যাবে। ই-বোমাতে আছে মাইক্রোওয়েভ সোর্স এবং পাওয়ার সোর্স। নিউক্লিয়ার ডেটোনেশনের সময় যে ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস নির্গত হয়, আল্ট্রাওয়াইডব্যান্ড ই-বোমার ফলেও সেটা তৈরি হয়। কিন্তু এখানে পারমাণবিক পদার্থের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় সাধারণ রাসায়নিক বিস্ফোরণ। একটা ন্যারোব্যান্ড ই-বোমা বার বার ব্যবহার করা যায়। নিজের পছন্দ মতো টিউন করা যায়। লেজারের মতো এ বোমার ফোকাস বিম লক্ষ্যবস্তুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, চারদিক ছড়িয়ে যায় না। ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ এক থেকে দশ গিগাহার্টজ নিয়ে ইলেক্ট্রনিক সিন্থ দিয়ে ঢাকা নিউক্লিয়ার ডেটোনেশন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। শত্রুপক্ষের বাস্কর মাটির যত গভীরে থাকুক না কেন, তাদের দেয়াল ঘড়ই মোটা হোক না কেন, ন্যারোব্যান্ড ই-বোমার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। কারণ মাইক্রোওয়েভ বিম লেজার বিমের মতোই তৈরি হয়।

ই-বোমা নিয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে- এ বোমার ক্রুড ফর্ম বানানোর জন্য টেকনোলজি সবার কাছেই আছে। এমনকি সন্ত্রাসীদের কাছেও। যারা রাডার বানাতে জানে, তারা এ বোমা সহজেই তৈরি করতে পারবে। ইতোমধ্যে কমপক্ষে বিশটা দেশ ই-বোমা নিয়ে গবেষণা করছে।

ই-বোমা বানানোর টেকনোলজি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে এটার খরাপ লোকের হাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। এটা একটা মারাত্মক সত্য। কিন্তু এর হাত থেকে মুক্তির পথ সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে মার্কিন সরকারও, দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

এর অপব্যবহার ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। একটা উদাহরণ: এক অপরাধী কম ক্ষমতাসম্পন্ন একটা মাইক্রোওয়েভ জেনারেটর জোগাড় করে সেটা একটা সুটকেসে ঢুকিয়েছে। এখন সে সেটা নিয়ে রাখল একটা প্যাচিস্টো ম্যাশিনের পাশে। এরপর সে মেশিনটা চালু করল। সাথে সাথে মেশিনটার মাথা ঘেন খারাপ হয়ে গেল। তার ভেতর যত কয়েন ছিল (কয়েন দিয়ে মেশিনটা চালু করতে হয়) সব বের হতে শুরু করল। এরপর মাঝে মাঝে সে বেশ কয়েকবার কাজটা করল। তবে শেষ পর্যন্ত সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

কয়েকটা সূত্র থেকে জানা যায়, রাশিয়ান সৈন্যরা চেকেনদের ওপর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। কারণ এটা বানানো খুব সহজ। মাইক্রোওয়েভ ওভেন দিয়েই একটা ছোটখাটো ই-বোমা বানানো যায়। তবে সেটা করা বোকামি হবে। ইন্টারনেটে সেটা বানানোর কৌশল বলা আছে।

ই-বোমা সম্পর্কে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে- বোমা ফাটানোর পর এর কোনো চিহ্ন থাকে না। কেউ বলতে পারবে না যে এখানে কোনো বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল।



# হীরার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী

মনীষা রায়

যে সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা বা যাচাই করা হয়, সেখানে একটি প্রশ্ন প্রায়ই দেখা যায়— পৃথিবীর সবচাইতে কঠিন পদার্থ কোনটি? আবার বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজেরও একটি জনপ্রিয় প্রশ্ন হচ্ছে— হীরা কাটা হয় কোন পদার্থ দিয়ে? দুটিরই উত্তর অভিন্ন— হীরা।

হ্যাঁ, হীরা পৃথিবীর সবচাইতে কঠিন পদার্থ এবং হীরা কাটতে হলে হীরারই সাহায্য নিতে হয়। আবার খুব ভঙ্গুর পদার্থ কাচ কাটতেও হীরার প্রয়োজন পড়ে। আজকাল অবশ্য অনেকে রশ্মি দিয়ে হীরা কাটার কথা বলে থাকেন, কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে খনি থেকে উত্তোলিত হীরা কেটে কেটে আকর্ষণীয় রূপ দিয়ে অলংকার বানাতে বা বিশেষ ছাঁচে আনতে সাহায্য নিতে হয় অন্য আরেকটি হীরারই।

পৃথিবীর সবচাইতে দামি পদার্থগুলোর মধ্যেও হীরা অন্যতম। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন বস্তুর মধ্যে হীরা দ্বিতীয় দামি পদার্থ। হীরা ব্যবহারিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের কাছে যেমন দামি, তেমনি প্রায়োগিক দিক থেকে সমান দামি বিজ্ঞানীদের কাছেও। অধিকাংশ মানুষই যেমন দামের কারণে হীরা কিনতে পারেন না, তেমনি প্রায়োগিক দিকের স্বল্পতার কারণেও অনেক বিজ্ঞানী হীরা নিয়ে গবেষণা করতে পারেন না। প্রকৃতিতে কম পাওয়া যায় বলে এ পদার্থটি সাধারণ ও অসাধারণ অর্থাৎ

বিজ্ঞানী— এ দুধরনের মানুষের কাছেই একটি কাক্সিত পণ্য হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিজ্ঞানীরা তবুও কৃত্রিম হীরা বানিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের সে সুযোগটুকু নেই।

সাধারণ মানুষ হীরা ব্যবহার করেন মূলত অলংকার হিসেবেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, তাতে হীরার একটি বড় ব্যবহার থাকে। আগেই বলা হয়েছে, কাচজাতীয় জিনিস কাটতে হলে হীরার সাহায্য নিতেই হয়। সুতরাং শিল্প-কারখানায়ও হীরার একটি বড় ব্যবহার রয়েছে। হীরার সাথে যোগসূত্র রয়েছে ইতিহাসেরও। বিখ্যাত কোহিনুর হীরার নাম কে না জানে। ভারতবর্ষের এ হীরা এখন শোভা পাচ্ছে ইংল্যান্ডের রানীর অলংকারের ভাণ্ডারে। বাণিজ্য করতে এসে একটানা দুশো বছর শাসন করার সময় ভারতবর্ষের গর্ব এই হীরাটিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরসূরীরা লুট করে নিয়ে যায়, যার সাথে জড়িত রয়েছে মোগল সম্রাটদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কোহিনুরের মতো আরো অনেক বিখ্যাত হীরা ইংরেজরা তো নিয়েছেই, নিয়েছে পর্ভুগীজরা, স্পেনীয়রাও বাণিজ্য কিংবা লুট করতে আসা অন্য বিদেশীরাও। হীরা নিয়ে রচিত হয়েছে কতশত কাহিনী। অভিশপ্ত হীরা বলে কিছু হীরার কথাও জানা যায়। সেসব হীরা যাদের কাছেই গেছে, তারাই কোনো না কোনোভাবে ধ্বংস হয়েছে

বলে মনে করা হয়। অবশ্য এগুলোর কতটা গল্প আর কতটা সত্যি, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে মানুষের ইতিহাসের সাথে কঠিন গঠনের হীরা জড়িয়ে আছে অনেকভাবেই। হীরার এতসব গুরুত্ব, উপযোগিতা ও ব্যবহারযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই একুশ শতকে এসে কঠিন গঠনের হীরার ব্যবহারিক গুরুত্ব আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই হারিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। হীরা নিয়ে যেসব গবেষণা করেন বিজ্ঞানীরা কিংবা শিল্প-কারখানায় যে হীরা ব্যবহার করা হয়, তার বদলে সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত নতুন কিছু কৃত্রিম পদার্থ। যেগুলো হীরার চাইতেও শক্তিশালী আণবিক গঠনের এবং ব্যবহারিক দিক থেকে আরো বেশি উপযোগী।

আমরা জানি, হীরা কার্বনজাতীয় যৌগ। কার্বন পরমাণু বিভিন্নভাবে অন্য পরমাণু বিশেষ করে হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যেমন কয়লা কিংবা কাচজাতীয় পদার্থ গঠন করে, তেমনি পরমাণুর গঠন বদলে এ কার্বন পরমাণু ধারাই গঠিত হয় হীরা। তার মানে দেখা যাচ্ছে, মূল উপাদান একই থাকলেও কেবল বিন্যস্ত কিংবা সংগঠিত হওয়ার কৌশলের কারণে একটি পদার্থ আরেকটি পদার্থের চাইতে আলাদা হয়ে পড়ছে। বদলে যাচ্ছে তাদের মূল বৈশিষ্ট্যও। এমনকি এক পদার্থের সাথে অন্য পদার্থের পার্থক্যও স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় না। যেমন





আমাদের পরিচিত  
পৃথিবীর সব উপাদানের  
মধ্যে এখন সবচাইতে  
শক্তিশালী পদার্থ হচ্ছে  
বাকিবলস হীরার স্থান  
এখন দ্বিতীয়তে।

হীরা পৃথিবীর অন্যতম কঠিন পদার্থ, কিন্তু  
কয়লা কিংবা কাচ ভঙ্গুর পদার্থের তালিকায়  
শীর্ষে অবস্থান করে। খনি থেকে যেসব যৌগ  
তোলা হয়, তার প্রতিটিই কার্বন যৌগ।  
পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, হীরা, কয়লা কিংবা  
অপরিশোধিত তেল- এর সবই কার্বন ও  
হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীর  
আদিতে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে  
বিশাল বিশাল সব গাছপালা ও অন্যান্য  
উপাদান মাটির নিচে চাপা পড়ে তাপের  
তারতম্যের কারণে এসব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের  
সৃষ্টি করেছে। তাপের এ ভিন্নতায় কোনো  
এলাকায় গড়ে উঠেছে হীরার খনি, কোথাও  
তেলের আবার কোথাও বা কয়লার খনি।

যদি কার্বনজাতীয় যৌগের এ বিন্যস্ত হওয়ার  
তারতম্যের কারণেই হীরা এমন শক্ত পদার্থে  
পরিণত হতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই  
পরীক্ষাগারে কার্বনজাতীয় যৌগ দিয়ে হীরার  
চাইতে শক্ত পদার্থও তৈরি করা সম্ভব।  
বিজ্ঞানীদের এ চিন্তার পেছনে মূল যে কারণটি  
কাজ করেছে তা হচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্প-  
কারখানায় হীরার চাইতেও শক্ত কোনো  
পদার্থের প্রয়োজন হয়। হীরা দিয়েও সেসব  
কাজ করা যায়, কিন্তু সে কাজ খুব দীর্ঘকাল  
সারতে হয়। ফলে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছিলেন  
এমন একটি পদার্থ তৈরি করতে, যা হীরার  
চাইতে শক্ত হবে। আর এ কাজে তারা কাজে  
লাগালেন হীরা তৈরির সূত্রটিকেই। অর্থাৎ  
কার্বনজাতীয় যৌগের পরমাণুর বিন্যাস নতুন  
করে সজ্জিত করে চেষ্টা করলেন নতুন একটি  
পদার্থ তৈরি করতে। বেশ কয়েক বছর প্রচেষ্টার  
পর অবশেষে বিজ্ঞানীরা এ ধরনের একটি নতুন  
কৃত্রিম পদার্থ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।  
কার্বনের কিছু 'ন্যানোরড'কে বিশেষ উপায়ে  
একত্র করে তারা এ পদার্থটি তৈরি করেছেন,  
যা হীরার চাইতেও শক্ত এবং কোনো কিছু  
আরো দ্রুত কাটতে কিংবা বিশ্লিষ্ট করতে  
সক্ষম। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে পদার্থটির একটি  
কোটামতো নামও দিয়েছেন। তারা এ  
পদার্থটিকে অ্যাগ্রিগেটেড কার্বন ন্যানোরড বা  
এসিএনআর বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে  
রসায়নের ভাষায় এর যে সংকেত দাঁড়িয়েছে তা

উল্লেখ করলে এ স্যায়স ওয়ার্ল্ড পত্রিকার অন্তত  
অর্ধেক পাতা লেগে যাবে। আর হয়তো বোঝাও  
যাবে না কিছুই। তাই সেদিকে না হয় না-ই  
গেলায়।

তবে এ অ্যাগ্রিগেটেড কার্বন ন্যানোরড বা  
এসিএনআর জিনিসটিকে বিজ্ঞানীরা  
অনানুষ্ঠানিকভাবে আরেকটি বিশেষ নামেও  
উল্লেখ করছেন (অবশ্যই তা তাদের  
ল্যাবরেটরির বাইরে)। তারা এ পদার্থটির নাম  
দিয়েছেন বাকিবলস (huckyballs)। আশা  
করা যায়, এ নামটিই পরবর্তীতে সাধারণ  
মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠবে। অন্যদিকে  
রসায়নবিদরা একে ডাকছেন কার্বন-৬০ নামে।  
এ বাকিবলসের প্রতিটি অনু ৬০টি এটম বা  
পরমাণু নিয়ে হেল্লগনাল বা পেটগনাল  
আকৃতিতে ফুটবলের মতো গঠিত।

কার্বন পরমাণুগুলোকে বিশেষ সজ্জিত  
করে সাধারণ বায়ুচাপের চাইতে অন্তত ২০০  
গুণ বেশি চাপ দিয়ে এবং ২২২৬ ডিগ্রি  
সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ল্যাবরেটরে তৈরি করা  
হয়েছে এ নতুন পদার্থটি। তৈরি করার পর  
পদার্থটি হীরার চাইতে কতগুণ শক্তিশালী তা  
পরীক্ষা করার জন্য ফ্রান্সে অবস্থিত ইউরোপ-  
য়ান সিনক্রোট্রোন রেডিয়েশন ফ্যাসিলিটি  
বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুটি সাধারণ  
হীরার মধ্যে অন্য একটি বিশেষ পদার্থ রেখে  
প্রথমে চাপ দিয়ে দেখা হয় দুটি হীরা কত চাপে  
সে পদার্থটিকে ভাঙতে পারে। হীরার পরীক্ষা  
শেষে একই পদার্থ এ নতুন বাকিবলসের মধ্যে  
রেখে চাপ দিয়ে ও অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষা করে  
দেখা যায়, এটি হীরার চাইতে ০.৩% বেশি  
শক্তিশালী। তার মানে হচ্ছে, আমাদের পরিচিত  
পৃথিবীর সব উপাদানের মধ্যে এখন সবচাইতে  
শক্তিশালী পদার্থ হচ্ছে বাকিবলস। হীরার স্থান  
এখন দ্বিতীয়তে।

এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মানেই হচ্ছে  
একগাদা টাকা খরচ। প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা  
কেন এতো টাকা খরচ করে হীরার চাইতে এ  
শক্ত পদার্থ বানাতে গেলেন। একটু আগে বলা  
হয়েছে, শিল্প-কারখানা ও বিজ্ঞানীদের  
গবেষণার বিভিন্ন কাজে হীরার চাইতে শক্ত  
পদার্থ দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ দরকার  
নিশ্চয়ই এতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তাদের  
কাছে। কারণ এখন পর্যন্ত কেউই 'হীরা দিয়ে  
কাজ সম্ভব না' জাতীয় মন্তব্য করেননি। যেহেতু  
এটি গবেষণাগারে তৈরি, তার মানে হচ্ছে  
সাধারণ মানুষ এটি অলংকার হিসেবেও ব্যবহার  
করতে পারবেন না। তাহলে বিজ্ঞানীরা কেন এ  
কাজটি করতে গেলেন? কী সুবিধা হবে এ  
নতুন পদার্থ দিয়ে? উত্তর দিচ্ছেন এ নতুন  
পদার্থ তৈরিতে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি  
নিজেই। জার্মানির ইউনিভার্সিটি অব বেরলিন-  
এর গবেষক নাভালিয়া ডুবরোভিনসকাইয়া  
নতুন এ পদার্থের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে  
গিয়ে বলেন- সব নতুন পদার্থই একদিন না  
একদিন পুরনো হবে। আবার গবেষণা কাজ  
যতো পুরনো হবে, আবিস্কৃত উপাদানটি উৎপন্ন  
করা ততো সহজ হতে পারে। এখন পর্যন্ত হীরা

সবচাইতে নির্ভরযোগ্যভাবে পাওয়া যায়  
খনিতে। সে হীরার পরিমাণও দিন দিন কমে  
আসছে। ফলে এখন থেকেই অন্য একটি পদার্থ  
আমাদের তৈরি করতে হবে, যা হীরার বিকল্প  
হিসেবে কাজ করতে পারে, সম্ভব হলে হীরার  
চাইতেও ভালো কাজ করতে পারে। সেই  
বিকল্প খুঁজতে গিয়েই আমরা এ প্রজেক্ট হাতে  
নিই। এ বাকিবলস নতুন তৈরি হলো মাত্র।  
পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ করা এখনো সম্ভব হয়নি।  
আর এটি যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে,  
তাই এখন এর দাম অবশ্যই অনেক বেশি  
হবে। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে আরো সহজ  
পদ্ধতিতে সম্ভাব্য এটি তৈরি করা যায়। যদি  
আমরা খুব সহজে এটি তৈরি করতে পারি,  
তাহলে আশা করা যায়, আগামী কয়েক  
দশকের মধ্যে এটি দ্রুত হীরার জায়গা দখল  
করবে।

এ বাকিবলসের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য  
ইতোমধ্যেই বেশ আলোচিত হয়েছে। শিল্প-  
কারখানায় উচ্চচাপের কারণে যেখানে অন্য  
পদার্থ টিকতে পারে না, বাকিবলস সেখানে খুব  
সহজেই কাজ করতে পারে। সাধারণ হীরা  
২০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি তাপমাত্রায়  
টিকতে পারে না। ফলে সে পরিবেশে কোনো  
কিছু কাটা এতোদিন সম্ভব হতো না। কাটতে  
হলে পদার্থটির তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রি  
সেন্টিগ্রেডের নিচে নামিয়ে এনে কাটতে হতো।  
ফলে অনেক সময় বস্তুর ঘনত্ব, উপাদান  
ইত্যাদিতে সমস্যা সৃষ্টি হতো এবং ঠিক যেভাবে  
বানানো দরকার, সেভাবে বানানো সম্ভব হতো  
না। বাকিবলস আবিস্কৃত হওয়ার কারণে এ  
সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা  
মনে করেন।

অন্যদিকে বিভিন্ন জিনিস ড্রিলিং বা ছিদ্র করা বা  
কাটার কাজে যে হীরা এতোদিন ব্যবহার করা  
হতো, তা যতোটুকু গভীর করে কাটতে  
পারতো, এ বাকিবলস তার চাইতে আরো  
গভীর করে এবং সূক্ষ্মভাবে কাটতে পারবে বলে  
বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ফলে এটি ড্রিলিংয়ের  
জগতেও নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করবে বলে তাদের  
ধারণা। তবে এর কোনোটিই এখন আপাতত  
করা সম্ভব হবে না, যদি না এর দাম কমানো  
হয়। আর অন্তত উতোদিন পর্যন্ত নির্ভর করতে  
হবে হীরার ওপরেই।

তবে হীরার যে ঐতিহ্য এতোদিনে গড়ে  
উঠেছে, সেটিরও একটি মূল্য রয়েছে। যেসব  
বিজ্ঞানী মনে করছেন, বাকিবলস সহজলভ্য ও  
সস্তা হলে হীরা হারিয়ে যাবে, তাদের এ আশা  
কিংবা আশঙ্কা সত্যি নাও হতে পারে। তাছাড়া  
অলংকার হিসেবে হীরার গ্রহণযোগ্যতা খুব  
শিগগিরই কমেবে বলে মনে হয় না। বাকিবলস  
জনপ্রিয় হলেও হীরার জনপ্রিয়তা কমতে নাও  
পারে। শিল্প-কারখানায় হীরার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে  
বাকিবলসের ব্যবহার খুব বেশি হতে পারে,  
কিন্তু মানুষকে সাজাতে হীরা ফেলে কেউ  
বাকিবলস তুলে নেবে বলে মনে হয় না।  
আসল জিনিস থাকতে কি কেউ কৃত্রিম জিনিস  
তুলে নেয়?



# পুরুষের শরীরেও জীবিত ভ্রূণ!

ফরিদুর রহমান পাছ

বিষয়টি নতুন এবং চমকপ্রদ, তবে অবিশ্বাস্য নয়। ১৬ বছরের একটি ছেলে পেটে বাচ্চাধারণ করেছে। সংবাদটি শুনে আতকে উঠবেন না কিংবা ছেলেটিকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দেবেন না, দয়া করে। কারণ সংবাদটি জনসমক্ষে ছড়িয়ে পরার পর এরই মধ্যে তাকে নিয়ে খুব

বেশি মাতামাতি হয়েছে। এমনকি তার কাছে এও জানতে চাওয়া হয়েছে, সে আসলেই পুরুষ কিনা! সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টি ছেলেটির জন্য একদিকে যেমন বিব্রতকর তেমনি ঝামেলারও। জেনে রাখুন আরেকটু তথ্য, ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশেই।

ছেলেটির নাম পলাশ (কাল্পনিক নাম, ডাক্তারের অনুবোধে নামটি গোপন রাখা হলো), বয়স বড়জোড় ১৬ বছর। এতদিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই ছিল। হঠাৎই হোট খেল পলাশ। অস্তিত্ব অনুভব করলো শরীরের অভ্যন্তরে অনাকাঙ্ক্ষিত এমন কিছু, যা নিয়ে সে চলতে পারছে না- কষ্ট



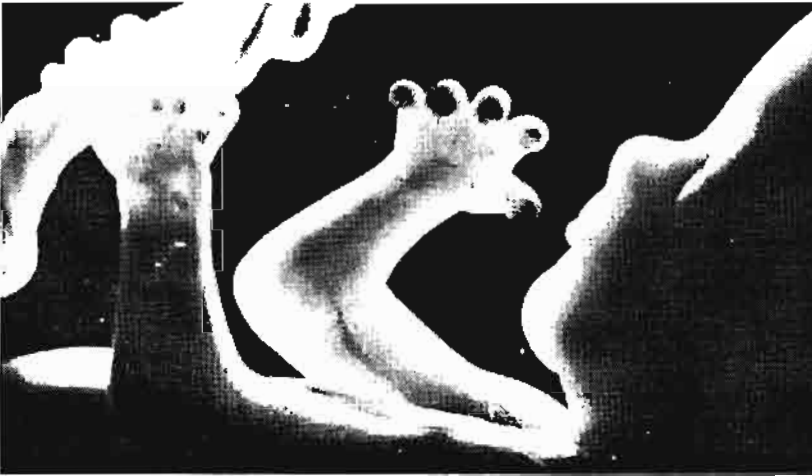
হচ্ছে। উপায়ন্ত না দেখে ডাক্তারের পরামর্শ নিল পলাশ। স্থানীয় ডাক্তার জানালেন, তার শরীরে টিউমার জাতীয় কিছু একটার অস্তিত্ব রয়েছে এবং দ্রুত অপারেশন করতে হবে। পলাশ যোগাযোগ করলেন ঢাকায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (পিজি হাসপাতাল)। সেখানে তার চিকিৎসা শুরু করলেন পিজি হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক এম এ মজিদ।

প্রথম দিকে তিনিও পলাশের শরীরের অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি টিউমার বলেই ধারণা করেছিলেন। তবে এও বুঝলেন টিউমারটি স্বাভাবিক নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তিনি জানলেন, পলাশের পেটে যে টিউমারটি রয়েছে তা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ বড়। ফলে তার চলতে কষ্ট হচ্ছে। এম এ মজিদ বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন, জানলেনও বিস্তর। এম-রে করে জানতে পারেন তিনি যা ভেবেছিলেন বিষয়টি তেমনই। টিউমারটি জটিল আকৃতি ধারণ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা ওটাকে টিউমারই বলা যায়। ডাক্তারি ভাষায় বললে বলতে হয় 'ফিটাস ইন ফিটো'।

ভাইয়ের পেটে ভাই!

'ফিটাস ইন ফিটো', ডাক্তারি পরিভাষা। সহজ করে বলতে গেলে বলা যায়, 'ভাইয়ের পেটে ভাই', যার প্রকৃত উদ্ভাষণ আকাশ। অধ্যাপক মজিদ ফিটাস ইন ফিটো বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জানালেন, মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় কোনো কারণে আকাশের জন্ম ভাইয়ের জগতি তার জগতের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু বিষয়টি এমনভাবেই ঘটে। ফলে আকাশ খুব স্বাভাবিক ভাবে জন্ম নেয় এবং বেড়ে উঠতে শুরু করে। সেই সাথে অপর জগতিও রয়ে যায় আকাশের শরীরের ভেতরেই। সেও বাড়তে থাকে। পেটের মধ্যে যতদূর সম্ভব বড় হয়ে ওঠার পর ওটা যখন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে তখনই আকাশের সমস্যা হতে শুরু করে। বলতে গেলে আকাশের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হতে শুরু হয়। আকাশ বুঝতে পারে, তার শরীরে এমন কিছু রয়েছে, যা তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে বাধা দিচ্ছে। আরো স্পষ্ট করে বললে, এটা চরমভাবে ভোগছে তাকে। প্রথম দিকে চিকিৎসকগণ টিউমার হিসেবে ধারণা করলেও

এর আগেও এমনটি ঘটেছে। তবে ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটার অনুপাত ২ : ১। তথ্যটি দেয়ার সাথে সাথে তিনি দেশের মানুষকে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টিকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানালেন। বললেন, কোনো মেয়ের শরীরে এমন একটি জগৎ পাওয়া গেলে আমাদের সমাজ তা সহজে মানতে পারতো না। কোনো কিছু না ভেবেই তাকে অপয়া বলে অপবাদ দিত। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে বিষয়টি মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এ দেশে প্রথম হলেও আগেও এমন ৮৮টি ঘটনার রেকর্ড আছে। তিনি বললেন, দুঃখজনক হলেও সত্য আকাশ পুরুষ, তারপরও ঐ ঘটনাকে আমাদের সমাজ সহজে মেনে নিতে পারছে না। তার কাছে জানতে চাইছে, সে আসলেই পুরুষ কিনা! অধ্যাপক মজিদ আকাশের সমাজের মানুষকে অনুরোধ করে বলেছেন, দয়া করে আকাশকে বিব্রত করবেন না। আকাশ পুরুষ এবং তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধ্যাপক মজিদ জানালেন, সিটি স্ক্যান করার পর আকাশের বিষয়টি ধরা পড়ে। এও জানালেন, আকাশ বর্তমানে সুস্থ আছে এবং দিবা তার কাজ করছে। অধ্যাপক মজিদ বিশ্বাস করেন এ ঘটনায় দেশের উদীয়মান চিকিৎসকদেরও অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করলো। উল্লেখ্য, প্রথমবার ফিটাস ইন ফিটো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছিল ১৮০৬ সালে, মিকেল নামের একজন চিকিৎসক প্রথম বিস্তারিত জানিয়েছিলেন বিষয়টি নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, জোড়া-বাচ্চার মতোই ঐ জগতি বেড়ে উঠতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে। তবে কোনো এক সময় ঐ জগতি বড় হতে শুরু করে এবং জীবিত মানুষটিকে সমস্যায় ফেলতে শুরু করে। বড় হওয়ার কারণে কখনো কখনো ঐ বর্ধিত জগতি শরীরের ভেতরের কোনো না কোনো অঙ্গগুকে চাপের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। যে কারণে ব্যাহত হতে পারে মানুষটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তার আগ পর্যন্ত ঐ জগতি নির্বিঘ্নেই বাড়তে পারে পোষক দেহে।



বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন এম এ মজিদ। গর্ভে থাকা অবস্থায় একটি জগৎ পরিপক্ক এবং অন্যটি অপরিপক্ক থাকলে, অপরিপক্ক জগতি পরিপক্ক জগৎ গিয়ে আশ্রয় খুঁজতেই পারে। সেক্ষেত্রে পরিপক্ক জগতি মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। তবে অপরিপক্ক জগতিও বসে থাকে না। ঐ অপরিপক্ক জগতিও বেড়ে উঠতে শুরু করে পরিপক্ক জগতির মাঝে। পরিপূর্ণ জগতের ভেতরে অবস্থান করে তার থেকেই খাদ্যগ্রহণ করে অপরিপক্ক জগতি। বেড়ে ওঠে স্বাবলীলভাবে। জানালেন বাংলাদেশে প্রথম ঐ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সার্জন অধ্যাপক এম এ মজিদ। আগস্টের ২১ তারিখ ঢাকা মেডিকেল কলেজের সন্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল 'ডিএমসি ডয়েস' নামের কলেজের মুখপত্র সংগঠন। সেখানেই নিজের অভিজ্ঞতা উদীয়মান চিকিৎসকদের জানালেন এম এ মজিদ।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানা যায় ওটা আসলে আরো একটি জগৎ। অধ্যাপক মজিদ বললেন, একটি জগতের মধ্যে আরেকটি জগৎ থাকলেই তাকে ফিটাস ইন ফিটো বলা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হয় বেড়ে ওঠা ঐ জগটিরও নিজস্ব মেরুদণ্ড আছে। কেননা, ওটা যে জগৎ ছিল তা প্রমাণ করা যাবে কেবল মেরুদণ্ড থাকলেই। আলোচনা সভাতে জানানো হয়, আকাশের শরীরের মধ্যে থাকা জগটির ওজন ছিল দেড় কেজির মতো। জগতি ডিম্বাকৃতির। রেডিওগ্রাফের মাধ্যমে শরীরের ভেতরে থাকা ঐ জগতিতে ভার্টিব্রাল কলাম, হিউমেরাস, ফিমার এমনকি টিবিয়ার অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া গেছে।

কাল্পনিক নয়, সত্যি

অধ্যাপক মজিদ তার বক্তৃতায় জানালেন, ভাইয়ের পেটে ভাই হওয়ার এ ঘটনা অহরহ ঘটে না। তবে এ ঘটনা একেবারে নতুনও নয়।

এবং জানা প্রয়োজন

মানবদেহের অনেক কিছু সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত ধারণা দিতে পারেননি। স্পষ্ট করে বললে, তারা এখনো অনেক কিছু জানেন না কিংবা আবিষ্কার করতে পারেননি। তাই বলে তারাও থেমে নেই। প্রতিনিয়তই চলছে বিজ্ঞানীদের গবেষণা। ফিটাস ইন ফিটো পুরনো আবিষ্কার হলেও বাংলাদেশের চিকিৎসকদের জন্য তা একেবারেই নতুন। দেশের মানুষের কাছে তো বটেই। তাই অধ্যাপক মজিদ দেশের সকল মানুষকে অন্য সব নতুন আবিষ্কারের মতো ফিটাস ইন ফিটোকেও সহজে মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন, এমন ঘটনায় পড়লে কাউকে বিব্রত করবেন না। এটা প্রকৃতিরই অংশ। আধ্যাত্মিকভাবে বললেন, সৃষ্টিকর্তার খেলা। অধ্যাপক মজিদ আকাশের সমাজের লোকের কাছেও তাকে বিব্রত না করার অনুরোধ জানিয়েছেন।



# ভায়োলেন্স ও মানসিক রোগ

আসিফ আনোয়ার

আব্রাহামের মতো শান্ত-সুবোধ বালক স্কুলে খুব একটা দেখা যায় না। সে পারতপক্ষে কাউকে বিরক্ত করে না। বরং বন্ধুরা কিছু না পারলে সে সাহায্য করে। স্পোর্টসে খুব একটা দক্ষ না হলেও স্পোর্টস টিমে তার উপস্থিতি অবধারিত। কারণ তার মতো করে স্পোর্টস টিমকে কেউ সাহায্য করতে পারে না। ম্যানেজারিয়াল কাজ তো সামলায়ই, কার কী সমস্যা, তা দেখার জন্যও সে একপায়ে খাড়া। কাউকে সে কোনো দিন আঘাত করেছে কিংবা মারামারি করেছে বলেও তার বন্ধুরা মনে করতে পারে না। কিন্তু যেদিন সকালে স্কুলে এসেই আব্রাহাম তার বাবার পিছু ল নিয়ে একে একে চার সহপাঠী ও বন্ধুকে গুলি করলো, সেদিন সবাই কিম্বা চেয়ে চেয়ে দেখলো একজন নিরীহ, শান্ত, উদ্র ছেলের উগ্রমূর্তি কিংবা ভয়ঙ্কর রূপ।

প্রশ্ন হলো, আব্রাহামের মতো একটি ভালো ছেলে কেন হঠাৎ করে এ কাজটি করলো? এ ধরনের কাজ সে আগে কখনোই করেনি। এমনকি সে কোনোদিন পিঙ্গলও হাতে নেয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে এ ধরনের ঘটনা প্রচুর ঘটে। পত্রপত্রিকায় প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা শিরোনাম হয়ে আসে। সবার কাছে ভালো এবং মেধাবী বলে পরিচিত কোনো শিক্ষার্থী বাহ্যত কারণ ছাড়াই যাকে তাকে মারছে, এটা মেনে নেয়া যে কারো পক্ষেই কঠিন। ঘটনা ঘটান পর তার বন্ধু-বান্ধব থেকে

গুরু করে মা-বাবা কিংবা প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করে দেখা গেছে, মারাত্মক ঘটনাটা ঘটান আগ পর্যন্ত তারা কেউ কিছু আঁচ করতে পারেননি। এমনকি তাদের ধারণাও ছিল না যে, সে এমন একটা ঘটনা ঘটাতে পারে।

গত পাঁচ বছরে অনেকগুলো এ ধরনের ঘটনা ঘটে। স্বভাবতই মার্কিন গবেষকরা এর কারণ ও প্রতিকার অনুসন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পুরো যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করে তারা রায় দেন যে, কিশোরদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে মারাত্মক ভায়োলেন্স প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং এর কারণেই তারা এ ধরনের ঘটনা ঘটান। তারা এটিকে অসুস্থতা বলেও তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেন।

যে কোনো সামাজিক গবেষণায় কোনো একটি ঘটনা ঠিক কী কারণে ঘটে তা নির্ণয় করা দুর্ভব। নৈব্যক্তিক গবেষণাগুলোতে গুণগত দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় বলে গবেষকরা সরাসরি কোনো কারণের কথা না বলে কিছু পরিবেশের কথা উল্লেখ করেন। তারা মূলত সেসব বিষয়কেই গুরুত্ব দেন, যেগুলো একজন মানুষকে সরাসরি কিংবা খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তারা দেখেছেন, সিনেমা কিংবা নাটকে ভায়োলেন্স প্রদর্শন এবং সেটা দেখে কিশোরদের ভায়োলেন্স করার প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা খুব কঠিন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সরাসরি এ

দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্কই স্থাপন করতে পারেননি অর্থাৎ তারা তাদের গবেষণায় দেখাতে পারেননি যে, সিনেমা কিংবা নাটকে ভায়োলেন্সজনিত ঘটনা বেশি ঘটান ফলে এসব কিশোর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটান। বিশেষ করে বন্দুক বা পিঙ্গল দিয়ে গুলি করে মারার সাথে তারা প্রদর্শিত ভায়োলেন্সের যোগসূত্র পাননি। কিন্তু গবেষণায় তারা এমন কিছু পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো কিশোরদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। মোট ১৫০০ কিশোরের ওপর গবেষণা করে তারা এর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে তাদের হতমত প্রকাশ করেছেন।

তাদের মতে এ ধরনের ভায়োলেন্স যতোটা না সিনেমা-নাটকের মাধ্যমে কিশোরদের মধ্যে সংক্রমিত হয়, তার চাইতে বেশি সংক্রমিত হয় মানসিক অসুস্থতার কারণে। ইতোপূর্বে বাড়ি, মার্কেট কিংবা স্কুলে গুলি করেছে এমন ১৫০০ কিশোরকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের প্রত্যেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ।

এ গবেষণার প্রধান গবেষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের গবেষক ফেলটন আর্লস মনে করেন, এসব কিশোর মানসিকভাবে অসুস্থ হলেও তাদের এই অসুস্থতা সংক্রমিত হয়েছে কিছু সামাজিক অসুস্থতার কারণে। উদাহরণ হিসেবে তারা বলছেন, কোনো কিশোর যদি তার সামনে কোনো ভায়োলেন্স সংক্রমিত হতে দেখে,





ভায়েলেপ্স এক প্রকার মানসিক রোগ। সুতরাং এ রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন। আমাদের পরিবার কিংবা প্রতিবেশী কোনো কিশোরের মধ্যে ভায়েলেপ্সের প্রবণতা দেখা দিলে নিজ উদ্যোগেই যেন আমরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

তাহলে তার মধ্যে সে ধরনের ভায়েলেপ্স করার ইচ্ছে জন্মিত হবে। অন্যদিকে ভায়েলেপ্স সংগঠিত হওয়ার সময় সেই কিশোর যদি তা প্রতিহত করতে যায়, তাহলে তার ভায়েলেপ্স করার ইচ্ছে জন্মিত হবে অন্তত কয়েকগুণ বেশি। কারণ সে যদি ভায়েলেপ্স প্রতিহত করতে সমর্থ হয়, তাহলে প্রচুর লোকের প্রশংসা পাবে। আর এ প্রশংসা ধরে রাখতে গিয়েই সে পরবর্তী সময়ে এমন কিছু কাজ করে বসবে, যেগুলো হয়তো সে স্বাভাবিক অবস্থায় করতো না। অন্যদিকে যদি সে ভায়েলেপ্স প্রতিহত করতে না পারে, অপমানিত হয় বা মার খায়, তাহলে এটির প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ ঝুঁকবে সে। এ মনোভাবই তাকে পরবর্তী সময়ে মারাত্মক কর্মকাণ্ড বা ভায়েলেপ্সের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সামাজিক ভায়েলেপ্সের আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে পারিবারিক ভায়েলেপ্স। সামাজিক ভায়েলেপ্স প্রকাশ্যে হয় খুবই কম। কিন্তু পারিবারিক ভায়েলেপ্সের পরিমাণ খুবই বেশি। একজন কিশোর যদি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনো ভায়েলেপ্স সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সেটি তাকে আঘাত করবে সবচাইতে বেশি। বিশেষ করে মা-বাবার মধ্যে ঝগড়াকে অনেক সময় কিশোররা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে ভায়েলেপ্স হিসেবে কল্পনা করতে পারে। তাই গবেষকরা সামাজিক ভায়েলেপ্স থেকে পারিবারিক ভায়েলেপ্সকে পৃথক করে দেখতে চেয়েছিলেন যে, এ দুই ভায়েলেপ্সের মধ্যে কোনটি কিশোরদের প্রভাবিত করে বেশি। তারা দেখেছেন, দুটির মধ্যে সামাজিক বা প্রকাশ্য ভায়েলেপ্সই কিশোরদের মনে ছাপ ফেলে বেশি। কারণ সেখানে বীরত্ব বা পৌরুষ দেখানোর সুযোগ থাকে, যা পরিবারে থাকে না। অন্যদিকে পারিবারিক ভায়েলেপ্সে বীরত্ব দেখানোর সুযোগ না থাকলেও সেখানে ছোট ছোট ভায়েলেপ্স এতো বেশি পরিমাণে হয় যে, আস্তে আস্তে সেগুলোই তাদের মনের মধ্যে বিশাল ক্ষোভ সৃষ্টি করে কিংবা তাদের আশাহত

করে। ফলে দু ধরনের ভায়েলেপ্সের প্রভাবের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য না থাকলেও ফলাফল শেষ পর্যন্ত একই হয়।

যেহেতু এটি একটি মানসিক অসুস্থতা, তাই অন্য অসুস্থতার মতো এরও চিকিৎসা আছে বলে গবেষকরা মনে করেন। তারা দেখেছেন, নতুন কোনো গুণ্ডা আধিকার না করেও এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রচলিত মানসিক সমস্যায় ভাজাররা যেসব গুণ্ডা ব্যবহার করেন, সেগুলো দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

গবেষণায় গবেষকরা নতুন একটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন, যা এর আগে কোথাও শোনা যায়নি। তারা বলছেন, কিশোরদের এই ভায়েলেপ্স করার যে প্রবণতা তা সংক্রামক। এর সংক্রামকতা কোনো কোনো সময় বেশি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যদি একদল কিশোরের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান বা স্ট্যাটাস একই হয় এবং সেসব কিশোর স্কুলে এক সাথে সময় কাটায়, তাহলে তাদের কেউ এ ধরনের সমস্যায় ভুগলে বাকিদের অনেকেই তাতে আক্রান্ত হতে পারে। গবেষকদের অন্যতম জেফরি বিনজেনহেইমার এটিকে অন্যতম সূচক হিসেবে এ গবেষণায় চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, যদি এ ভায়েলেপ্স প্রবণতা কিশোরদের মধ্যে একসাথে সংক্রমিত হয়, তাহলে তাদের চিকিৎসাও একই সাথে করতে হবে।

গবেষকদের মতে কিশোরদের এ সমস্যা সমাধানে সবচাইতে বেশি সহায়তা করতে পারে স্কুল। অত্রাহামের উদাহরণটিই এখানে তারা ব্যবহার করেছেন। যেহেতু অত্রাহামের মধ্যে বন্ধুদের উপকার করার প্রবণতা বেশি ছিল, তাই সে খুব বেশি মানুষের সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছিল। তাকে যেতে হয়েছিল অনেক জায়গায়। ফলে সে এই অল্প বয়সেই অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। অত্রাহাম স্কুলের সবার উপকার করলেও সে দেখেছে, তার উপকার কেউ যেচে

এসে করছে না। কিংবা যে যে কাজে ঝামেলা বেশি, সেগুলো সবাই অত্রাহামের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। গবেষকরা বলছেন, সম্ভবত অত্রাহাম বাড়িতেও এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। বেশি বেশি এসব পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে থাকতে অত্রাহামের মধ্যে প্রতিশোধ প্রবণতা জন্ম নেয় এবং যে কারণে সে কোনো একদিন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে চারজনকে গুলি করে বসে। গবেষকরা মনে করছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি অত্রাহামের প্রতি আরেকটু মনোযোগ দিত, তাহলে এ ঘটনাটা হয়তো ঘটতো না।

স্কুল কর্তৃপক্ষ যেহেতু দেখাচ্ছে, অত্রাহামের মধ্যে একটি সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে, তার মধ্যে টিম স্পিরিট কাজ করে সবচাইতে বেশি, বন্ধুদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে অনেক, সুতরাং কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল অত্রাহামের এ স্পিরিট ও মনোভাব সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। যাতে করে অত্রাহামকে সব কাজ একাই না করতে হয়। অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সব শিক্ষার্থীকে অত্রাহামকে উদাহরণ হিসেবে ধরে শেখাতে পারতো, এগুলো করলে তাদের মানুষ সম্মান করবে, তারা জীবনে বড় হতে পারবে, তাহলে অত্রাহামের সহপাঠীরা এ বিষয়গুলো চর্চা করতে পারতো। ফলে অত্রাহামের ক্ষোভ জন্মানোর কোনো কারণ থাকতো না এবং এ ঘটনাটিও ঘটতো না।

গবেষকরা পুরো গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন পাঁচ বছর ধরে। ১৯৯৫ সালে একটি স্কুলের এক ছাত্রের হাতে কয়েকজন সহপাঠী নৃশংসভাবে খুন হওয়ার পর তারা প্রথম এ ধরনের একটি গবেষণা করার উদ্যোগ হাতে নেন। কিন্তু সে বছর আর কোনো ঘটনা না ঘটায় তারা সেটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু ১৯৯৬ সালে এ ধরনের আরো কয়েকটি ঘটনা পরপর ঘটায় নতুন করে সেটি সম্পর্কে তারা চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু আনুসঙ্গিক আরো কিছু কাজ সারতে তাদের কয়েকটি বছর পার হয়ে যায়।

অবশেষে ১৯৯৯ সালে তারা পুরো কাজটি শুরু করে এবং ২০০৫ সালের শুরুতে তারা এ রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টের ফলাফল ইতোমধ্যে নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং গবেষকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব স্কুলে রিপোর্টটি পাঠিয়ে দিতে আগ্রহী বলে জানা গেছে। কারণ তারা মনে করছেন, তাদের এ রিপোর্টে স্কুল কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে যে কথাগুলো বলা আছে, সেগুলো জানা থাকলে কীভাবে ভায়েলেপ্স ঠেকানো যায়, সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবে।

আগেই বলা হয়েছে, ভায়েলেপ্স করা এক প্রকার মানসিক রোগ। সুতরাং এ রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন। আমাদের পরিবার কিংবা প্রতিবেশী কোনো কিশোরের মধ্যে ভায়েলেপ্সের প্রবণতা দেখা দিলে নিজ উদ্যোগেই যেন আমরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, গবেষকরাও আমাদের কাছে সে আশা করছেন।

তথ্যপ্রযুক্তির খাত উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার অনলাইন বা ইন্টারনেট। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন একদিকে যেমন আমাদের জীবনযাত্রার মানকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনি কিছু ক্ষেত্রে তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রম বা প্রতারণার ক্ষেত্র। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ প্রায় সবাই কম-বেশি ই-মেইল সার্ভিস ব্যবহার করে থাকেন। সাম্প্রতিক বিশ্বে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের খাতিরে ই-মেইল ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়েছে। আর ঠিক ঐ বিষয়টিকে মাথায় রেখে একশ্রেণীর অসংখ্য লোকেরা তা থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। সত্যিকার অর্থেই সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটে প্রতারণা এক প্রকার ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যা, অবিশ্বাস, প্রলোভন, বিভ্রম, ব্যক্তিগত খবর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে প্রচার করে প্রতারণা চলছে। এক সময় এ জাতীয় প্রতারণাগুলো বেশিরভাগ সংঘটিত হতো দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা নাইজেরিয়ার মতো দেশগুলোতে কিন্তু এখন তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশেও এ ধরনের প্রতারণা স্বল্প আকারে লক্ষ্য করা গেছে। উত্তেজনার বশে, ক্ষোভে কিংবা অজ্ঞতার কারণে কিংবা লোভে পড়ে অনেকে এ পথে পা বাড়িয়েছে। নিজের ই-মেইল থেকে কিংবা সুযোগ পেলে অন্য কারো ই-মেইল ব্যবহার করেও বিভিন্ন ঘটনায় সূত্রপাত ঘটছে। কিছু সময় পূর্বেও দেখা গেছে কিছু বাজে মনোবৃত্তির লোকেরা অনেকে বিভ্রান্তভাবে ই-মেইলের মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছে। অবাক ব্যাপার হলো এ থেকে আমাদের স্বীয় প্রধনমন্ত্রী কিংবা বিরোধী দলীয় নেত্রী কেউই বাদ পড়েননি।

সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত প্রতারণার মাধ্যমটি হলো 'অ্যাডভান্স ফি ফ্রন্ড'। এ প্রতারণার মূল লক্ষ্য হলো বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অ্যাডভান্স ফির নাম করে অর্থ আদায় করা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মেইলের মাধ্যমে এ ধরনের অফারগুলোর বেশিরভাগই আসে নাইজেরিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো থেকে। এ ধরনের জালিয়াতিগুলো এসব দেশে 'জালিয়াতি ৪১৯' নামে সমধিক পরিচিত। এসব মেইল যারা পাঠিয়ে থাকেন

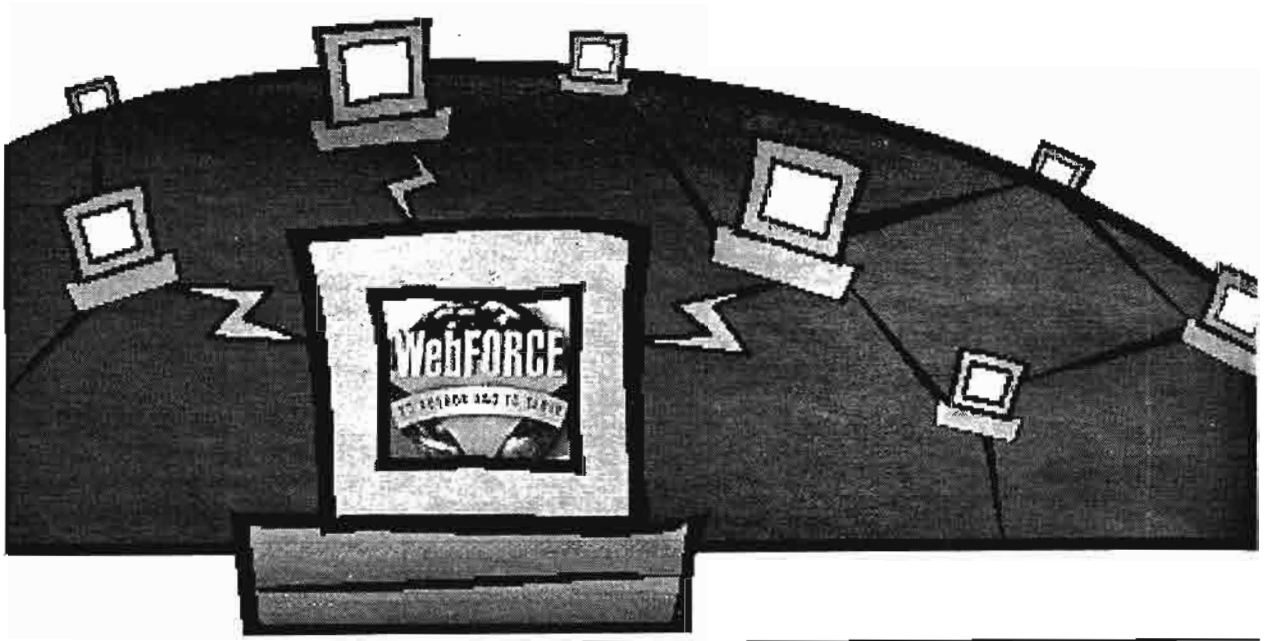
তাদের বেশিরভাগের পরিচয় দেয়া হয় বিশাল অভিজাত কিংবা সমৃদ্ধশালী পরিবারের সদস্য হিসেবে যেমন- মন্ত্রী বা আমলা, সেনাপ্রধান বা জেনারেল, প্রকৌশলী, ডাক্তার, বিশাল ইভান্স্ট্রিয়ার্লিস্ট, খনির মালিক প্রভৃতি। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় এসব পরিচয় উল্লেখ করে স্ত্রী, পুত্র কিংবা কন্যারা মেইল পাঠান। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে বেশিরভাগই যুবতী মহিলা কিংবা তরুণী বলে পরিচয় দেন। মেইলে এ বিষয়ে তথ্যাদি বেশ বিস্তারিতভাবে পাঠানো হয়, যার সারসংক্ষেপ হলো মেইল প্রেরণকারী বিপুল পরিমাণ অর্থ কিংবা সম্পদের মালিক।

অর্থের প্রয়োজনে কিংবা কারো দাবিদাওয়া পূরণে ব্যর্থ হয়ে সমস্ত সম্পত্তি বেহাত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখন মেইল রিসিভকারী যদি সহায়তা করেন তাহলে তিনি উদ্ধারকৃত সম্পত্তির মোটা অংশের মালিক হতে পারবেন। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ মেইলের নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিটি হন ব্যারিস্টার কিংবা অ্যাডভোকেট। সাথে অবশ্যই যোগাযোগের ঠিকানা, মেইল কিংবা ফোন নম্বর দেয়া হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটে প্রতারণা এক প্রকার ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যা, অবিশ্বাস, প্রলোভন, বিভ্রম, ব্যক্তিগত খবর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে প্রচার করে প্রতারণা চলছে।

# অনলাইন প্রতারণা

হাসিব হাসান







প্রতারকরা এটিএম বা  
ক্রেডিট কার্ডে অর্থ উঠানোর  
পাশাপাশি সেভিংস, কারেন্ট  
সব ধরনের একাউন্ট থেকে  
জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ  
উত্তোলনের চেষ্টা করছে।

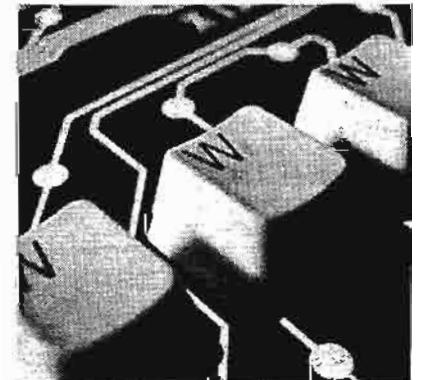
প্রায় ক্ষেত্রে এসব বিষয় গোপন রাখতে বলা হয় কিংবা জরুরিভিত্তিতে যোগাযোগের জন্য বলা হয়। জানানো হয় প্রয়োজনে আগে দলিল চুক্তি করে নেয়া হবে। এ ধরনের একটি মেইল কিছুদিন আগে প্রবাসী একজন বাংলাদেশী পেরেছিলেন। এটি পাঠান দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক জেনারেলের মেয়ে। মেইলে উল্লেখ করা হয় মেয়েটির প্রয়াত বাবা বিপুল অঙ্কের ডলার রেখে গেছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তথাপি পরিবেশগত কারণে মেয়েটি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে ইচ্ছুক নয়। মেয়েটি মেইলে জানায়, সে এসব অর্থ আমেরিকায় পাঠিয়ে নিজেও চলে আসতে চায়। এজন্য তার যে কোনো একটি একাউন্ট প্রয়োজন। মেয়েটি জানায় এ সাহায্যের বিনিময়ে সে ভালো অঙ্কের কমিশন দিতে রাজি। প্রবাসী ভদ্রলোক বিস্তারিত শুনে মেয়েটিকে সাহায্য করতে রাজি হন এবং নিজের একাউন্ট সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি দেন, যাতে মেয়েটি নিশ্চিত হতে পারে। পরিণামে মেয়েটি নিশ্চিত হলেও প্রবাসী ভদ্রলোকের একাউন্ট দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে অনিচ্ছয়তায় পড়ে যায়। এরপর মেয়েটি আর যোগাযোগ করেনি। এক সময় আর্থিক প্রয়োজন হলে ভদ্রলোক ব্যাংক থেকে জানতে পারেন তার একাউন্ট থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঝোঁয়া গেছে। ভদ্রলোকের তখন আর বুঝতে বাকি থাকেনি তিনি প্রতারকের পাল্লায় পড়েছেন। এ ধরনের প্রতারণা প্রায়ই ঘটেছে। দেখা গেছে, বিশ্বের বড় বড় ব্যাংকগুলোতে এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা বেশি ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মেক্সিকো, হংকং, সিঙ্গাপুর কোনো দেশই বাদ পড়ছে না এ ধরনের প্রতারণা থেকে। প্রতারকরা এটিএম বা ক্রেডিট কার্ডে অর্থ উঠানোর পাশাপাশি সেভিংস, কারেন্ট সব ধরনের একাউন্ট থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের চেষ্টা করছে। প্রতারকরা তাদের নিজস্ব যেসব একাউন্টের কথা উল্লেখ করে থাকে প্রায় ক্ষেত্রেই সেসব ব্যাংকের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে

যাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে এসব ক্ষেত্রে আরো ভয়ঙ্কর ঘটনাটিও ঘটে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতারক আমন্ত্রণ জানায় প্রকৃত বিষয়াদি এসে জেনে যাওয়ার জন্য। যদি কোনো ব্যক্তি এসব আমন্ত্রণে সাড়া দেন তাহলে তার কপালে কী ঘটে তা অনেক ক্ষেত্রে জানার সুযোগও থাকে না। মেরে না ফেললেও প্রতারকেরা যে দুঃস্থপূর সৃষ্টি করে তার দহন প্রতারিত ব্যক্তিকে বহুদিন পোহাতে হয়। এমন ঘটনা কিছু দিন আগেও আরেক প্রবাসী ভারতীয়ের কপালে ঘটেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব দায়ী ব্যক্তিদের পরবর্তীতে খুঁজে যাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্টদের মতে প্রধানত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, যেমন- ঘানা, সিয়েরা লিওন, কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন প্রভৃতি দেশগুলোতে প্রতারণামূলক ঘটনাগুলো বেশি ঘটে থাকে। প্রতারণার আরেকটি অন্যতম পন্থা হলো ই-মেইল মিতালী। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর ব্যবহারকারীরা এ ধরনের মেইলগুলো বেশি পেয়ে থাকেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, পোল্যান্ড, রুম্যানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশ থেকে এ জাতীয় মেইল বেশি আসে। তবে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি আসে রাশিয়ার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে। দেখা গেছে, এ ধরনের মেইলগুলো সাধারণত মেয়েরা করে থাকে। মেইলগুলোতে মেয়েরা নিজেকে আকর্ষণীয় বলে দাবি করে থাকে, যাতে মেইল রিসিভকারী সহজেই আকৃষ্ট হন।

অনেক ক্ষেত্রে ছবি এমনকি মিথ্যা ছবি ও ভুল তথ্য দেয়া হয়। এরপর আবেদনে বা মেইলে বলা হয়, কিছু অর্থ পেলে কিংবা প্লেনের টিকিটের অর্থ পেলে মেইল প্রেরণকারী চলে আসবেন রিসিভকারীর কাছে। বেশিরভাগ যুবকেরা এ ধরনের মেইলে প্রতারিত হয়ে থাকেন। অর্থ পাঠানোর পর মেয়েটির আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। বেমালুম গায়েব হয়ে যায় মেয়েটি, বন্ধ হয়ে যায় যোগাযোগ। এক সময় যুবকটি বুঝতে পারে সে প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে। এরপর আর কিছু করার থাকে না। এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে অনলাইন বা ইন্টারনেট চ্যাটিং। শাস্ত্রীয় বিধায় চ্যাটিং সর্বত্র জনপ্রিয়। প্রায়ই দেখা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবতী কিংবা নারীদের সাথে পুরুষেরা ই-মেইল আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাই এ ধরনের ঘটনাগুলো বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় এর রোধকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রে সন্দেহজনক এসব চ্যাটিং মনিটর করা হয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে গিয়ে বেশ কয়েকজন ধরা পড়েছেন। কিছু দিন আগে পত্রিকায় এ ধরনের একটি ঘটনা প্রকাশ পায়। এক মার্কিন ধনকুবের মেইলে এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলে তিনজন মেয়েকে নিয়ে লং আইল্যান্ডের একটি হোটেলে উঠেছিলেন। গোয়েন্দারা অবশ্য খবর পেয়ে এর আগেই সেখানে হাজির হন। গ্রেপ্তার হন ব্যক্তিটি। এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। সেখানে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এ কাণ্ডটি ঘটায় একজন কিশোরীকে

নিয়ে। অন্যদিকে অনলাইনে কেনাকাটা বিষয়টি সুযোগ-সুবিধা আর সময় বাঁচিয়ে দিলেও এক্ষেত্রেও চলছে প্রতারণা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হোলসেল, ব্যবসায় গোটানোর বিজ্ঞাপন, সামারসেল, ডিসকাউন্ট, ক্রয়ারেস প্রভৃতি ঘোষণা দিয়ে ক্রেতাদের প্রতারণা করছে। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেসব পণ্যের মূল্য কমার কথা প্রকৃত অর্থে তার মূল্য তেমন কম নয় কিংবা পণ্যের মান ভালো নয়। আবার কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে অর্ডার দেয়া হয়েছে এক রকম আর পাওয়া গেছে আরেক রকম। খুলে ফেলার পর তা আর ফেরত যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে ফেরত পাঠানোর চিন্তা করা হলেও আনুষঙ্গিক ব্যয়মূল্যের কথা চিন্তা করে তা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এসব পূর্বের নতুন সংযোজন ডিভি লটারি সংক্রান্ত প্রতারণা। এতে করে অনেকে ফরম পূরণ না করেও লটারিতে বিজয়ী হয়ে যাচ্ছে। চলে আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাগজপত্র। নাম-ঠিকানা এবং মন্ত্রণালয়ের চিহ্ন সবই আছে কিন্তু বাস্তবে তা অস্তিত্বহীন। যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। প্রতারক সময়মতো বা নির্দিষ্টক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখকৃত ঠিকানা বা আশেপাশে হাজির থাকে অথবা ভুয়া নামে একাউন্ট খোলে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয় প্রাপক বিজয়ী হয়েছেন, এখন প্রসেস করতে কিংকিত অর্থ প্রয়োজন। অর্থ পেয়েই সটকে পড়ে প্রতারক। এ ধরনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকান সরকার সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সুতরাং এসব মেইল থেকে সাবধান। যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত মেইল পেলে বা এ ধরনের মেইল পেলে উদ্ধাসিত হওয়ার কারণ নেই। এসব খোঁজখবর নিয়ে যতটুকু সম্ভব যাচাইয়ের চেষ্টা করুন। প্রয়োজনবোধে যে দেশ থেকে এসেছে সেখানকার দূতাবাসে খোঁজ নিন।

আপনার সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে যোগাযোগ করুন। তারা আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। বেশি আকারে বা সংখ্যায় এলে তাদের বলুন এসব মেইল আসা বন্ধ করে দিতে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি এসব অনাকাঙ্ক্ষিত মেইলের কোনো জবাব না দেন। স্কেননা, অনেক ক্ষেত্রে তা ভাইরাস আকারে আপনার কম্পিউটারে স্থান পেলে নিজে থেকেই তথ্য বের করার চেষ্টা চালাতে পারে। সুতরাং আগে থেকেই সাবধান হোন। চেষ্টা করুন এসব সমস্যা এড়িয়ে যেতে, সকলকে একই পরামর্শ দিন।



# আধুনিক প্রযুক্তিই বিশ্ব অশান্তির মূল কারণ



পক্ষে

প্রযুক্তি অবশ্যই কল্যাণ ও উন্নয়নের ধারক ও বাহক। এ প্রযুক্তির ইতিবাচক দিক যেমন আছে, তেমনি আছে নেতিবাচক দিকও। ধরা যাক, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের কথা। ইন্টারনেট অবশ্যই তথ্য সহযোগিতায় নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা নিষিদ্ধ বিষয়ের স্বাদ নিচ্ছে। এতে তাদের চারিত্রিক অবনতি ঘটছে। ইন্টারনেটে ই-মেইলের মাধ্যমে গোপন তথ্য আদান-প্রদান, ফাঁস, হুমকি এসবই নেতিবাচক দিক। এবার ধরা যাক, মোবাইল ফোনের কথা। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও অপরাধ জগতের বাসিন্দারা ঘনিষ্ঠ সহজতর যোগাযোগ করতে পারছে। মোবাইলে হুমকি, মুক্তিপণ দাবি-এসবই নিত্যদিনকার ঘটনা। সুতরাং প্রযুক্তি যদিও কল্যাণকর, কিন্তু এর প্রয়োগ ক্ষেত্রে অকল্যাণও ঘটছে এমন প্রমাণও কম নয়। তাই বলা যায়, আধুনিক প্রযুক্তিই বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টের মূল কারণ আর বিশ্ব অশান্তির মূল কারণ আধুনিক প্রযুক্তি।

মোছাঃ নাসরিন পারভিন  
মেহেরপুর।



পক্ষে

প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবন আজ হুমকির সম্মুখীন। বর্তমান বিশ্বের সকল অশান্তির মূলে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। বিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি করেছে আধুনিক মারণাস্ত্র, পারমাণবিক বোমা, নিউক্লিও বোমা, গ্রেনেড প্রভৃতি মানব বিধ্বংসী অস্ত্রপাতি। আর এসব অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমার বিক্ষোভের বিভিন্ন দৃশ্যের কথা বিশ্ববাসী আজও ভুলতে পারেনি। প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আজ একটি জাতি অন্য জাতিকে করে রাখছে পদদলিত। বর্তমান বিশ্বে উন্নত দেশগুলো প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্বল দেশগুলোকে তাদের অধীনে অবনত করে রাখছে। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে যুদ্ধ, বিগ্রহ, মারামারি, হত্যা প্রভৃতি। ফলে তারা নিজেরা যেমন তাদের ধ্বংস ডেকে আনছে, তেমনি সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিচ্ছে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানুষ পৃথিবীতে অশান্তি ডেকে আনছে। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আধুনিক প্রযুক্তিই বিশ্ব অশান্তির মূল কারণ।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম  
বড় হরিশপুর, নাটোর।



বিপক্ষে

আধুনিক সভ্যতায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানশক্তির প্রয়োগবিষয় কর্মকাণ্ডই হচ্ছে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞানকে মানুষ কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রবণতা থেকে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা এসেছে বিজ্ঞানের সহায় হিসেবে। প্রযুক্তির বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করে তা মানুষের প্রসারি প্রয়োজনের পরিধিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে নিত্য নতুন উপকরণ।

প্রথম যুগে ছিল বাস্পীয় যন্ত্রের প্রাধান্য। দ্বিতীয় যুগে বিদ্যুতের প্রাধান্য এবং বর্তমান যুগে রয়েছে পারমাণবিক বা সৌরশক্তির প্রাধান্য। আরো অনেক আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতেই বিশ্ব ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে উপকারী প্রযুক্তির পাশাপাশি কিছু অপকারী প্রযুক্তিও যে আবিস্কৃত হচ্ছে না তা নয়। তবে তার জন্য প্রযুক্তি দায়ী নয় বিজ্ঞানের একমাত্র পরিচালক মানুষ। মানুষ যে দিকে বিজ্ঞানকে নিয়ে যা বিজ্ঞানও সে দিকে ধাবিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে বিশ্বশান্তি।

শ্যামল সূত্রধর

উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১মবর্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।



বিপক্ষে

অপরের দয়া-দাক্ষিণ্যে বেড়ে ওঠা কোনো মানুষ যদি তার দাতা অবদানকে অস্বীকার করে তবে তাকে অকৃতজ্ঞ বলা হয়। অকৃতজ্ঞ দাতাকে নয় বরং নিজেকেই হেয় করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রযুক্তি তার পিঠে মানুষকে বসিয়ে সেই গুহাবাসী থেকে আজকে গগনচুম্বী অট্টালিকাবাসী করেছে, পশুনির্ভর যাতায়াত ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করেছে 'কনকর্ড' নামক দ্রুত গতিসম্পন্ন উড়োজাহাজে। চিকিৎসা, শিক্ষা বিনোদন- এসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবদান বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রযুক্তি মানুষকে শিখিয়েছে কিভাবে লোহাকে জলে ভাসানো যায়, আকাশে উড়ানো যায়, পাথরের পাহাড়কে কেটে মসৃণ সমতলে পরিণত করা যায়। এখন মানুষ যদি লোহাকে ছোরাতে পরিণত করে এবং সেটা ফল কাটায় ব্যবহার না করে নাশকতামূলক কাজে ব্যবহার করে, তবে তার দায়ভার অবশ্যই প্রযুক্তির ওপর বর্তাবে না। আপনি কি জানেন আপনি যে টিভি সেটের সামনে বসে ইরাক-আমেরিকা, ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের কথা শুনেছেন আপনার বাসায় রোজ যে পত্রিকা রাখা হয়, আপনি কি একবারও চিন্তা করেছেন এত দ্রুত এতগুলো খবর কিভাবে আপনার সকালের নাস্তার টেবিলে এলো? আপনি যে কাগজ ও কলম ব্যবহার করে প্রযুক্তিকে গালমন্দ করছেন, আপনার কি একবার মনে হয়নি এসব প্রযুক্তিরই অবদান।

মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, গেরপুর।

আগামী সংখ্যায়  
বিতর্কের বিষয়

‘প্রযুক্তির ব্যবহারই কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে’

১৫০ শব্দের মধ্যে পক্ষে অথবা বিপক্ষে আপনার মতামত লিখে পাঠান  
২০ অক্টোবর ২০০৫ এর মধ্যে। লেখার সাথে অবশ্যই ছবি পাঠাবেন।



এলজেইমারকে অনেকে চিত্তভ্রংশ বা ব্রেন-ওয়াল্টিং ডিজিজ অর্থাৎ মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যাওয়ার রোগ বলেন। এক সময় ভাবা হতো এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। এরপর কিছু কিছু গবেষক বলেছেন, এর চিকিৎসা আছে তবে সম্পূর্ণ সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থায় আনার কৌশল বা ওষুধ তাদের জ্ঞান নেই। এক্ষেত্রে অতি সম্প্রতি এক আশার সঞ্চার করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক। তাদের মতে ফোলেট নামক এক ধরনের বি-ভিটামিন পরিমাণ মতো নিয়মিত গ্রহণ করা হলে এলজেইমারের মতো অনেক ধরনের চিত্তভ্রংশতা কাটিয়ে ওঠা যায় এবং দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন। এজন্য দামি কোনো ওষুধ খেতে হয় না কিংবা কোনো কৌশলেরও প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় অঞ্চলভেদে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলমূল, লতাপাতায়ুক্ত সবুজ শাকসবজি, এসপারাগাস, ব্রোকলি, বিভিন্ন ধরনের শিম জাতীয় ফল, সিদ্ধ মটরের পুডিং এবং প্রাণীর কলিজা। এসব খাবারে বিশেষ ধরনের বি-ভিটামিন থাকে। এ ভিটামিন সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলছেন ফোলেট। এলজেইমার প্রতিরোধে এর রয়েছে অকল্পনীয় এবং সম্ভাবনাময় ক্ষমতা। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে প্রতিদিনকার খাবার তালিকায় পথ্য হিসেবে এসব খাবার অন্তর্ভুক্ত হলে এলজেইমার হয়নি এমন

ব্যক্তি বা ইতোমধ্যে যারা এলজেইমারে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের এলজেইমার জটিল আকার ধারণ করার বা এলজেইমারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকবে না। অর্থাৎ এলজেইমারের ঝুঁকি একেবারেই কমে যাবে।

এর আগেও একবার গবেষকরা বলেছিলেন, এলজেইমারের ঝুঁকি কমাতে উপরিউক্ত খাবার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে গত আগস্টে সর্বশেষ গবেষণা রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলছেন, যেসব খাবারে বি-ভিটামিন ফোলেট বিদ্যমান সেগুলো নিয়মিত খেলে এলজেইমারের ঝুঁকি থাকে না এবং যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা ক্রমেই সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট এলজেইমারস্ এন্ড ডিমিনশিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে। এ প্রেক্ষিতে গবেষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে গবেষকরা জানান, এলজেইমার আক্রান্ত রোগীর শরীরে বিদ্যমান রক্তে এক ধরনের অ্যামিনো এসিড হোমোসিস্টাইন থাকে। ফোলেটের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। আর তাই ফোলেট বিদ্যমান বি-ভিটামিনযুক্ত খাবার খেলে রক্তে যেহেতু হোমোসিস্টাইন কমে যায়, সেহেতু এলজেইমার আক্রান্ত হওয়া বা আক্রান্ত

ব্যক্তির ঝুঁকিও কমে যায়। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে, হার্ট ডিজিজ বা হৃদরোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এ হোমোসিস্টাইন কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং হৃদরোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যত ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি হয় এ হোমোসিস্টাইন নামক অ্যামিনো এসিড তার জন্য দায়ী। তাই সংশ্লিষ্ট গবেষকরা ভাসকুলার ডিজিজ এবং এলজেইমার ডিজিজ হওয়ার ক্ষেত্রে অ্যামিনো এসিড হোমোসিস্টাইনের কোনো যোগসূত্র আছে কি না এবং থাকলে কেমন- তা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন।

এছাড়া উক্ত গবেষণা পরিচালনার সময় দেখা গেছে, ফোলেট বিদ্যমান খাবার বিশেষত কলা, কমলা, লতাপাতায়ুক্ত সবুজ শাকসবজি, এসপারাগাস, ব্রোকলি, কলিজা, বিভিন্ন ধরনের শিম ও সিদ্ধ মটরের পুডিং গর্ভধারণকালীন মায়েরদেরও বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। ফোলেট বিদ্যমান খাবার খেলে সন্তান প্রসব করার সময় বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার কারণে যে নিউরাল ডিফেক্ট ইফেক্টের সৃষ্টি হয় তাও প্রতিরোধ করা যায়। এ সময় বিভিন্ন কারণে মায়ের মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ডে এক ধরনের যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার সৃষ্টি হয়।

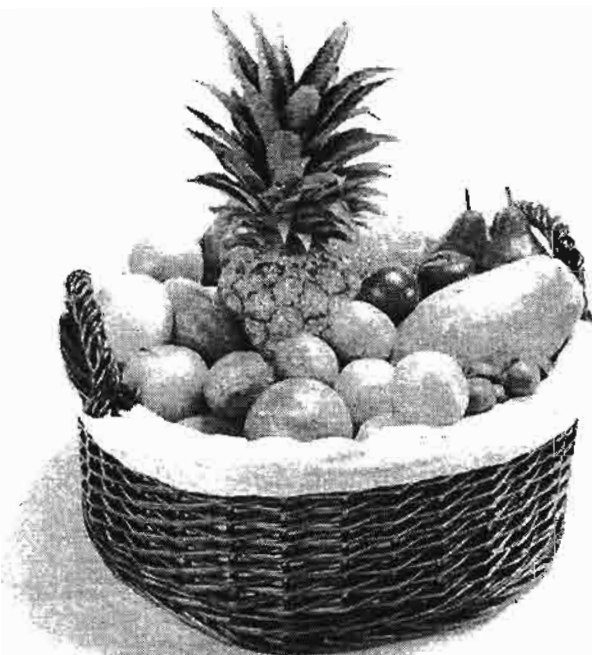
এ গবেষণায় গবেষকরা ৫৭৯ জন পুরুষ এবং ৬০ জন নারীর ওপর গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। এ গবেষণার লক্ষ্য ছিল কিভাবে বা কোন কৌশলে মানুষের দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করা যায়। এ সময় নজর রাখা হয় এক সত্তাহে গবেষণায় অংশ নেয়া উক্ত নারী-পুরুষ কী ধরনের খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে দেখা যায়, যেসব নারী-পুরুষ তাদের খাবার তালিকায় ফোলেট সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন তারা অন্যদের তুলনায় এলজেইমারে আক্রান্ত হওয়ার কম ঝুঁকিসম্পন্ন ছিলেন। গবেষণায় অংশ নেয়া মাত্র ৫৭ জন খাদ্য তালিকায় ফোলেট সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত না করায় অন্যদের তুলনায় অধিক হারে এলজেইমারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির সীমায় চলে আসেন। এছাড়া ৫৫ শতাংশ ফোলেট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ায় এলজেইমারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির বাইরে থাকেন। এজন্য সি-ভিটামিন, ক্যারোটিনো আইডস এবং ভিটামিন বি<sub>১২</sub> কোনো ভূমিকা রাখেনি। রেখেছে বি-ভিটামিন ফোলেট।

এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে কী ফোলেট বিদ্যমান খাবার বেশি বেশি খাওয়া উচিত? না, তা নয়। সীমার অতিরিক্ত নয়, পরিমাণ মতো খাওয়া উচিত— এ কথা বলেছেন রুশ এলজেইমারস্ ডিজিজ সেন্টারের পরিচালক ড. ডেভিন এ. বেনেট। তিনি আরো বলেছেন, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষক ম্যারিয়া এম. কোরোডা এলজেইমার হওয়ার জন্য যে-হোমোসিস্টাইন অ্যামিনো এসিডকে দায়ী করেছেন তা এখনো সুনিশ্চিত নয়। তার মতে যেসব কারণে এলজেইমার হয়, তার মধ্যে অন্যতম হোমোসিস্টাইন— এ কথা নির্দিষ্টভাবে স্বীকার করা যায়। এলজেইমারের কারণ নির্ধারণে এটা একটা বিশ্বয়কর কৌশল। এ কৌশলকে ক্রিনিক্যাল পর্যায় থেকে প্রায়োগিক পর্যায়ে আনা সম্ভব হলে খুব সহজেই যে কোনো ব্যক্তি এলজেইমারের ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ওষুধের কোনো ভূমিকা থাকবে না। ভূমিকা থাকবে বিভিন্ন ধরনের খাবারের।

[সিএনডিএস অবলম্বনে]

## এলজেইমার প্রতিরোধক বি-ভিটামিন ফোলেট

প্রাণ কানাই রায় চৌধুরী



মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে দুটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক। এক : জুকবক্সে গান শোনার জন্য পয়সা দিতে হয়; অনেকটা কয়েন দিয়ে টেলিফোন করার মতো। এখন আপনাকে সেটা করতে হচ্ছে না। মোবাইল ফোনটা জুকবক্সের সামনে একবার ঘোরান। ব্যাস, কাজ হয়ে গেল। দুই : খেলা দেখতে যাচ্ছেন আপনি। টিকিট কেনার কোনো ঝামেলা নেই। মেশিনের সামনে মোবাইল ফোনটা ধরুন। তারপর স্টেডিয়ামে প্রবেশ করুন।

এটা কোনো সায়েন্স ফিকশন গল্পের দৃশ্য নয়। বলা যায় দিনের আলোর মতো সত্য। ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটা উন্নত দেশের কথা বলা যায়, যেখানে ইতোমধ্যেই মোবাইল কমার্স শুরু হয়ে গেছে। এসব দেশের মানুষজন সোডা কিনতে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করছে না। বরং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করছে। গাড়ি চালকেরা পার্কিং ফি দিচ্ছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

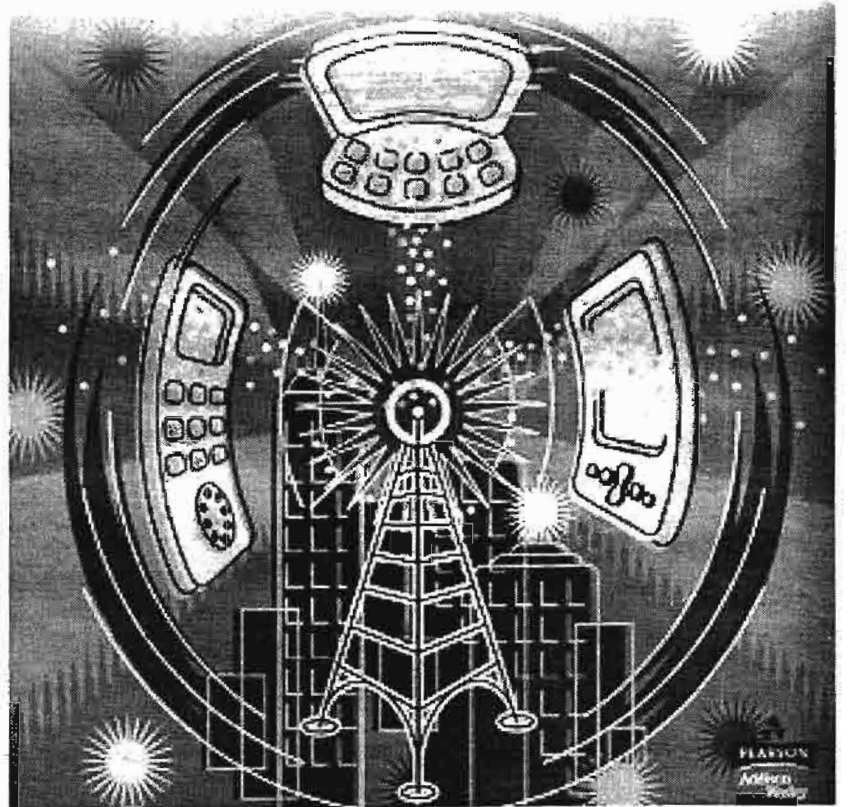
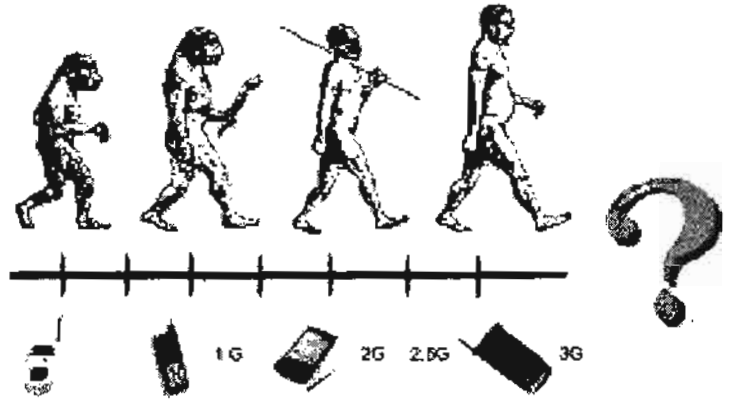
সুইডেন, আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের গাড়ি চালকেরা এখন পার্কিং মিটারে পয়সা ফেলছে না। বরং তারা গাড়ি পার্কিং করার জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেক্স মেসেজ পাঠাচ্ছে। ফলে পয়সা ফেলার কোনো ঝামেলা তাদের পোহাতে হচ্ছে না।

জাপান মোবাইল কমার্সে একধাপ এগিয়ে গেছে। সেখানকার একটি কোম্পানির নাম ডুকোমো ইনক। এ কোম্পানির কাস্টমারের সংখ্যা হচ্ছে দুই লাখ যারা ক্রেডিট কার্ড বা মানিব্যাগ নিয়ে ঘোরে না। তবে সাথে মোবাইল ফোনটা থাকতে হবে। সেখানেই সব ব্যবস্থা আছে। তারা ২০০০ রকমের পণ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারছে। রহস্যটা হলো তাদের সবার মোবাইলে বিস্ট-ইন-ক্রেডিট কার্ড বসানো আছে। ফলে আলাদাভাবে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঘোরার ঝামেলা তাদের আর নেই। এ কোম্পানি এখন

জাপান মোবাইল কমার্সে একধাপ এগিয়ে গেছে। সেখানকার একটি কোম্পানির নাম ডুকোমো ইনক। এ কোম্পানির কাস্টমারের সংখ্যা হচ্ছে দুই লাখ যারা ক্রেডিট কার্ড বা মানিব্যাগ নিয়ে ঘোরে না। তবে সাথে মোবাইল ফোনটা থাকতে হবে।

# মোবাইল কমার্স

এ কে এম মনির হোসেন





আরেকটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। সেটা হলো যাত্রীকে যাতে ট্রেনের টিকিট কিনতে না হয়, তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের টিকিট কিনতে হবে না। সেটা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করা যাবে।

যতই সময় যাচ্ছে ততই টেকনোলজির উন্নতি হচ্ছে। সেই সাথে উন্নয়ন হচ্ছে ব্যবসায় পদ্ধতির। ফলে মোবাইল কমার্স দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

মোবাইল ফোনে এখন যে ব্যাপারটা বেশি ঘটছে, সেটা হলো রিংটোন ডাউনলোড করা। এটা এমন পর্যায়ে গেছে যেখানে মানুষ কল কম করছে কিন্তু রিংটোন ডাউনলোড করছে বেশি। অর্থাৎ মানুষ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গান কিনছে এবং সেই সাথে তারা এটাও বোঝাচ্ছে যে, সুযোগ থাকলে তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনেক কিছুই কিনতে আগ্রহী। আর এটাই হচ্ছে মোবাইল কমার্সের সূত্রপাত। আমাদের দেশেও এটা শুরু হয়েছে।

তবে রিংটোনের ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে গেছে আমেরিকার জনগণ। ২০০৪ সালে আমেরিকার গ্রাহকরা শুধু রিংটোনের পিছনে খরচ করেছে প্রায় ২২৩ মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে মোবাইল ফোনে ভিডিও ক্যামেরা, সাধারণ ক্যামেরাসহ এমপিথ্রি প্রেয়ার আগে থেকেই সেট করা থাকে। ভবিষ্যতে এটার সম্প্রসারণ ঘটবে। যেমন জাপানে মোবাইল ফোনে ক্রেডিট কার্ডের সিস্টেম চালু হয়েছে। ফলে মিউজিক কোম্পানিগুলো ছাড়াও অন্যান্য কোম্পানি মোবাইল কমার্সে জড়িয়ে পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

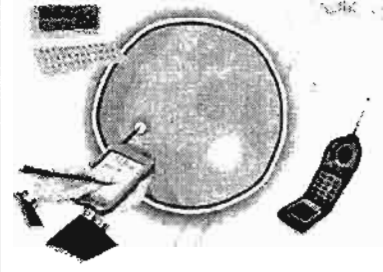
ফাস্টফুড থেকে শুরু করে সিনেমার টিকিট পর্যন্ত কেনা সম্ভব হবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে—এরকম একটা সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।

মোবাইল ফোনের বাজারে মোটোরোলা হচ্ছে খুব জনপ্রিয় একটা নাম। আসলে ফোন প্রস্তুতকারক কোম্পানির ভেতর মোটোরোলা হচ্ছে দ্বিতীয়। তারা এখন মোবাইল ফোনে ক্রেডিট কার্ড সিস্টেম চালু করতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কোম্পানি মাস্টারকার্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০০৬ সালের তেতর মোবাইল ফোন দিয়ে ক্রেডিট কার্ডের কাজ চালানো যাবে। আপনাকে আর কষ্ট করে ক্রেডিট কার্ড কোনো মেশিনে ঢুকাতে হবে না। সরাসরি মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই সেটা করতে পারবেন।

মোবাইল ফোনে ক্রেডিট কার্ডের সিস্টেমটা ইতোমধ্যে মেনে নিয়েছে ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানি এবং সেভেন ইনক নামে আমেরিকার ৫৩০০ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।

এবার যে ঘটনার কথা বলব সেটাকে আপনি অবিশ্বাস্য মনে করবেন। রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন। আপনার চোখ গেল বিজ্ঞাপনের দিকে। ইলেক্ট্রনিক বিজ্ঞাপন সেটা। মনে করুন কোকাকোলার বিজ্ঞাপন। জিনিসটা আপনার পছন্দ হলো। মোবাইল ফোনটা বিজ্ঞাপনের সামনে ধরুন। সাথে আপনার মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে বিজ্ঞাপনদাতার ওয়েবসাইট খুলে যাবে। আপনি ইচ্ছা করলে এখন থেকে কোকাকোলা কিনতে পারবেন। সেটা অবশ্য নিতে হবে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে। এরকম হাজার হাজার জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকবে, যেখানে মোবাইল কমার্সের ব্যবস্থা হবে একটা সাধারণ ঘটনা।

আমেরিকাতে ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করেছে। স্প্রিন্ট কোম্পানির কাস্টমাররা তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কোম্পানির ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারছে, সেই সাথে কিনছে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পণ্য। কোম্পানি তাদের



আমেরিকাতে ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করেছে। স্প্রিন্ট কোম্পানির কাস্টমাররা তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কোম্পানির ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারছে, সেই সাথে কিনছে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পণ্য। কোম্পানি তাদের কাস্টমারদের ক্রেডিট কার্ডের বিস্তারিত বিবরণ নেটওয়ার্কের খুব নিরাপদ এবং গোপন জায়গায় সংরক্ষণ করছে যাতে কাস্টমাররা কোনো ভোগান্তির শিকার না হয়।

কাস্টমারদের ক্রেডিট কার্ডের বিস্তারিত বিবরণ নেটওয়ার্কের খুব নিরাপদ এবং গোপন জায়গায় সংরক্ষণ করছে যাতে কাস্টমাররা কোনো ভোগান্তির শিকার না হয়।

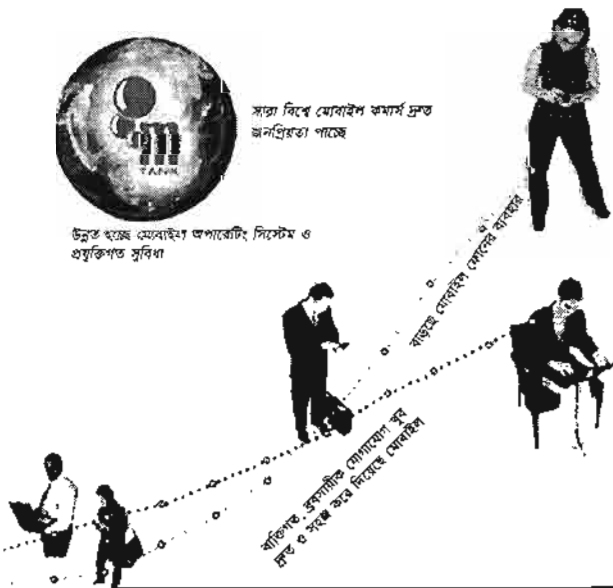
এক মার্কিন গবেষক জানাচ্ছেন, মোবাইল কমার্সের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তার হিসাব মতে ২০০৪ সালে মোবাইল কমার্সে ইউরোপে খরচ হয়েছে ২৪৩ মিলিয়ন ডলার। এটা ২০০৯ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ১.২ বিলিয়ন ডলারে। ২০০৪ সালে মোবাইল কমার্সে এশিয়ায় খরচ হয়েছে ৩৭০ মিলিয়ন ডলার। এটা ২০০৯ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ১.৭ বিলিয়ন ডলারে।

সোজা কথায় বলতে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, কিছু কিনতে গেলে আপনাকে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করতে হবে না, আপনাকে বের করতে হবে মোবাইল ফোন। তাই মোবাইল ফোন ছাড়া আপনি বাইরে বের হতে পারবেন না। কারণ প্রয়োজনীয় সবকিছু আপনাকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করতে হবে। কাজেই এখন থেকে প্রস্তুত হোন।



সত্তা বিবে মোবাইল কমার্স দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে

উন্নত হচ্ছে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ও প্রযুক্তিগত সুবিধা





ফলে পৃথিবীর বর্তমান গড় তাপমাত্রা  $15^{\circ}$  সে বা  $59^{\circ}$  ফারেনহাইট। এ প্রতিক্রিয়া না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা  $19.9^{\circ}$  সে বা  $0^{\circ}$  ফা থেকে  $19.9^{\circ}$  সে-এর বেশি হতো না।

গত ৫ জুন ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সে দিবসে পরিবেশ দূষণের কেন্দ্রবিন্দু গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া, এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবী বিপর্যয়ের পাশাপাশি সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ-বিপর্যয়কেও তুলে ধরা হয়। গ্রিন হাউস শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'সবুজ ঘর' বা 'কাচের ঘর'। ইদানীং শীতপ্রধান ও মরুময় তেলপ্রধান দেশে বড় ধরনের উদ্ভিদ উদ্যান নিদিষ্ট মাত্রায় তাপ ধরে রেখে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য 'গ্রিন হাউস' তৈরি করা হয়। গ্রিন হাউস সূর্যের আলো আসতে বাধা দেয় না, তবে এর কাচের আচ্ছাদন বা সূর্যের তাপশক্তি ধরে রাখে। শীতপ্রধান দেশে সূর্যালোক খুব কম বলে সেসব দেশে এ কাচের ঘরের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে তাপ সৃষ্টি করে গাছপালা জন্মানো হচ্ছে; যাকে 'গ্রিন হাউস' বলা হয়।

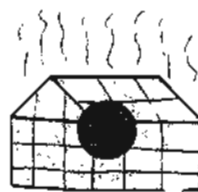
# গ্রিন হাউস প্রভাব এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

আসিফ

লক্ষ-কোটি প্রাণের সমারোহে পরিপূর্ণ আমাদের এ পৃথিবী নামক শ্যামল গ্রহ। এ শ্যামল গ্রহপৃষ্ঠ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় আকাশে তাকালে আমরা যে তারটি জ্বলজ্বল করতে দেখি তাকে শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা বলে। আসলে সন্ধ্যার পশ্চিমাকাশে দৃশ্যমান এ তারটি হলো সূর্যের দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র। বেতার টেলিস্কোপের মাধ্যমে জানা গেছে, শুক্র গ্রহ প্রচণ্ড উত্তপ্ত। আমেরিকার পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগানের মতে, শুক্র গ্রহের প্রচণ্ড উত্তাপের মূল কারণ হলো মারাত্মক গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া। প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড ( $CO_2$ ) থাকার কারণে এ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে প্রতিনিয়ত এসিড বৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এক সময় মনে করা হতো শুক্র গ্রহ পানির মেঘে মোড়া, যেখানে একদিন মানুষ যেতে পারবে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প থাকার কারণে আমাদের পৃথিবীতেও গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া আছে। এ গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়াই এক সময় আমাদের পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছিল। তাই তাপ অপরিবাহী কয়ল সৃষ্টির

গ্রিন হাউস সূর্যের আলো আসতে বাধা দেয় না, তবে এর কাচের আচ্ছাদন বা সূর্যের তাপশক্তি ধরে রাখে। শীতপ্রধান দেশে সূর্যালোক খুব কম বলে সেসব দেশে এ কাচের ঘরের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে তাপ সৃষ্টি করে গাছপালা জন্মানো হচ্ছে



গ্রিন হাউস প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া : পৃথিবীর তাপ ও শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্যরশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে মূলত দৃশ্যমান স্বচ্ছ আলো হিসেবে। এর সবটুকু অংশ মূলত পৃথিবীর কাজে লাগে না বলে ভূপৃষ্ঠ অতিরিক্ত অংশ ছেড়ে দেয়। তবে তা আর দৃশ্যমান আলো হিসেবে কাজ করে না, করে অবলোহিত বিকিরণের (Infra-red-radiation) মাধ্যমে। বায়ুমণ্ডলে কিছু গ্যাস আছে; যেমন— কার্বন ডাই-অক্সাইড ( $CO_2$ ), নাইট্রাস অক্সাইড ( $N_2O$ ), মিথেন ( $CH_4$ ), জলীয়বাষ্প ( $H_2O$ ), ওজোন ( $O_3$ ), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC), যাদের অণু দৃশ্যমান আলোর জন্য স্বচ্ছ এবং তা সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়তে কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। তবে এরা অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে। ফলে বিকিরিত তাপের সবটুকু মহাশূন্যে চলে যাওয়ার পরিবর্তে একাংশ আবহাওয়ামণ্ডলে থেকে যায়। কতটুকু তাপ এভাবে থেকে যাবে তা নির্ভর করে কী পরিমাণ এ ধরনের গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে তার ওপর। বায়ুমণ্ডলে এ ধরনের গ্যাস যতই বাড়বে, ততই সেখানে তাপ আটকে রাখার





বাংলাদেশের পাশাপাশি মালদ্বীপের মতো দ্বীপপ্রধান দেশ এবং লন্ডন, নিউইয়র্ক, সিউল, বেইজিং ইত্যাদি শহরের জন্য গ্রিন হাউসের মারাত্মক প্রভাব হবে হুমকিস্বরূপ।

মতো একটি ঢাকনার সৃষ্টি হবে, যা গ্রিন হাউস ঢাকনার মতো কাজ করে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি করছে গ্রিন হাউস প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

#### গ্রিন হাউস গ্যাস

গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্যাসগুলোকেই মূলত গ্রিন হাউস গ্যাস বলে। পূর্বে গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে মূলত CO<sub>2</sub>-কে দায়ী করা হলেও বর্তমানে জানা গেছে, পুরো সমস্যার ৫০%-এর জন্য দায়ী CO<sub>2</sub> এবং বাকি অর্ধেকের জন্য দায়ী অন্য গ্যাসগুলো; যেমন— মিথেন ১৯%, সিএফসি ১৭%, ওজোন ৮%, নাইট্রাস অক্সাইড (N<sub>2</sub>O) ৪% এবং জলীয় বাষ্প (H<sub>2</sub>O) ২%।

এসব গ্রিন হাউস গ্যাস যদি হঠাৎ বায়ুমণ্ডল থেকে উধাও হয়ে যায়, তবে পৃথিবী রাতারাতি পরিণত হবে প্রাণহীন শীতল গ্রহে এবং নেমে আসবে নিউক্লিয়ার শীত। ফলে ডাইনোসরদের মতো অতিকায় প্রজাতির বিলুপ্তির ন্যায় মানবজাতির ঘটবে করুণ বিলুপ্তি।

তাই এসব গ্যাসের পরিমিত উপস্থিতি পৃথিবীর স্বাভাবিক ও অনুকূল অস্তিত্বের জন্য খুবই জরুরি। তবে লক্ষ্যণীয় যে, শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে বহু শিল্পকারখানা এবং যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া থেকে এ জাতীয় গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

#### গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎস বা উৎপত্তি

প্রতিনিয়ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন মানুষ প্রতিদিন গড়ে প্রায় দু পাউন্ডের মতো CO<sub>2</sub> বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দিচ্ছে। আবার এ বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান ও চাষাবাদের জন্য উজাড় হচ্ছে বনাঞ্চল। অথচ এ বনাঞ্চলই সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল CO<sub>2</sub>-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখছে।

এ জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহন এবং শিল্পকারখানা। এগুলোর নির্গত ধোঁয়া থেকে CFC, N<sub>2</sub>O, O<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। তাছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানি; যেমন— তেল, গ্যাস, কাঠ, কয়লা এগুলোর দহনের ফলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ CO<sub>2</sub> হলেও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে N<sub>2</sub>O গ্যাসের তাপ ধারণ ক্ষমতা CO<sub>2</sub>-এর ১৫০ গুণ এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এ গ্যাসের মাত্রা ৩৪% বাড়বে। মিথেন (CH<sub>4</sub>)-এর তাপধারণ ক্ষমতা CO<sub>2</sub>-এর ২০ গুণ এবং বছরে তা ২% করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার CFC-এর তাপ ধারণ ক্ষমতা CO<sub>2</sub> থেকে ২০ হাজার গুণ বেশি, যার ঘনত্ব বছরে ৫% - ৮% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবার CFC-এর তাপ ধারণ ক্ষমতা CO<sub>2</sub> থেকে ২০ হাজার গুণ বেশি, যার ঘনত্ব বছরে ৫% - ৮% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্লোরিন, ফ্লোরিন ও কার্বন সমন্বয়ে গঠিত এ যৌগটি

(CFC) ১৯২০ সালে আবিষ্কৃত হয়, যা হিমায়নে (যেমন : ফ্রিজ, এয়ারকুলার) ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এটি বায়ুমণ্ডলের ট্র্যাপোফিয়ারে অক্ষত অবস্থায় থাকে। আবার ওজোন স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার থেকে পৃথিবীকে অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ থেকে বর্মের মতো রক্ষা করে চলেলেও ট্র্যাপোফিয়ারে O<sub>3</sub> সক্রিয় গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে কাজ করে, যার তাপ ধারণ ক্ষমতা CO<sub>2</sub> থেকে অনেক বেশি।

গ্রিন হাউস প্রভাব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পুরোটাই বিশাল বঙ্গীয় বঙ্গীপের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন দেশ থেকে বন্দনদীপ্তলো এ বঙ্গীপে এসে মিলিত হয়েছে এবং দেশের প্রায় অর্ধেক ভূভাগই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ মিটার অধিক উচ্চ। পরিবেশ গবেষকদের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রের পানির উচ্চতা ১৩ সেমি বাড়বে এবং দেশের ভূভাগের মোট আয়তনের এক শতাংশেরও কম ভূমি এগিয়ে আসা সাগরের পানিতে তলিয়ে যাবে।

সবচেয়ে চরম পরিস্থিতিতে এ দেশের ১৮ শতাংশ জমি সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে গেলে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১৫ শতাংশের স্থানচ্যুতি ঘটবে। সেই সঙ্গে কয়েক মিলিয়ন টন খাদ্য উৎপাদন ব্যাহতসহ ২ মিলিয়ন ঘরবাড়ি, ১৫ হাজার কিমি রেলপথ, ২০ হাজার কিমি কাঁচা-পাকা রাস্তা এবং ৪ - ৫ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চরম প্রতিকূল অবস্থায় ২১০০ সাল নাগাদ জনগোষ্ঠীর ৩৫ শতাংশের স্থানচ্যুতিসহ মোট উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মূল্যমানের ফসলসহ, ঘরবাড়ি, রাস্তা ও অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সাগরের বুকে বিলীন হয়ে যাবে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টিপাত, ঝড়-জলোচ্ছাস এবং বন্যার প্রাকোপ বৃদ্ধি পাবে। যার প্রমাণ ১৯৯০ সালের ভয়াল জলোচ্ছাস এবং ১৯৯৮ সালের সর্বপ্রাচীণ বন্যার মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পেরেছি। বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা, কলকারখানা ও যানবাহনের নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নির্বিচারে বন উজাড় করার ফলে মূলত গ্রিন হাউস প্রভাবের শিকার হচ্ছে।

ওধু বাংলাদেশ নয়, পরিবেশ দূষণের এ ভয়াল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যদি সতর্ক না হই তবে এ শতাব্দী হবে পৃথিবীর জন্য বিপর্যয়ের অশনি সংকেত। বাংলাদেশের পাশাপাশি মালদ্বীপের মতো দ্বীপপ্রধান দেশ এবং লন্ডন, নিউইয়র্ক, সিউল, বেইজিং ইত্যাদি শহরের জন্য গ্রিন হাউসের মারাত্মক প্রভাব হবে হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার পাশাপাশি মেফ অঞ্চলের বরফ ক্রমাগত গলতে থাকবে সেইসাথে বাড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। অর্থাৎ আমাদের এ শ্যামল-সুন্দর পৃথিবী শিকার হতে যাচ্ছে ভয়াল পরিবেশ ও সামাজিক বিপর্যয়ের। যে অবস্থা থেকে উঠে আসার ব্যবস্থা এখনই না নিলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ হতে পারে অগ্নিতুল্য গুরু গ্রহের মতো।



# সমুদ্রের সন্ত্রাস হাঙ্গর

হাসিব রেজা রনি

হাঙ্গরের ঘাণশক্তি বেশ প্রবল। সে কারণে সামান্য রক্তের গন্ধ পেলে এদের ছুটে আসতে তেমন দেরি হয় না। রক্তের ক্ষীণধারার সন্ধান পেলেই তারা সুচারুভাবে শিকারের দিকে এগিয়ে আসে।

সাগরে বিচরণরত অসংখ্য প্রাণীর মাঝে হাঙ্গর অন্যতম। তবে অনেকের কাছেই প্রাণীটি বিখ্যাত হওয়ার পরিবর্তে কুখ্যাত হিসেবেই বেশি সমালোচিত। হাঙ্গরকে মূলত সামুদ্রিক প্রাণী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সমুদ্রে বসবাস করলেও

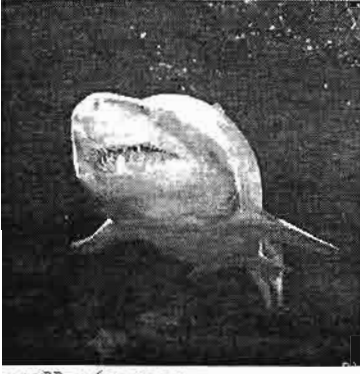
এরা বর্ষায় সমুদ্র ছেড়ে নদীর মোহনায় আসে ডিম ছাড়ার জন্য। তবে এটা ঠিক যে, হাঙ্গর সাধারণত কম গভীর পানিতে আসে না। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির হাঙ্গর দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীবিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ প্রজাতির হাঙ্গরের সন্ধান পেয়েছেন।

অনেকে মাছ ও হাঙ্গরকে এক প্রজাতির বলে মনে করে থাকেন। সেটা ভুল। কেননা, মাছ কঠিনাঙ্গি সমৃদ্ধ প্রাণী। মাছের সাথে হাঙ্গরের আরেকটি পার্থক্য রয়েছে তা হলো মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে পানির মাধ্যমে আর এই পানি মাছেরা মুখ দিয়ে টেনে নিয়ে চাপ দেয়। সেই চাপের ফলে পানি ঝিল্লি দিয়ে বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে হাঙ্গরকে অনবরত ছুটে বেড়ানো হয়। হাঙ্গরের শরীরে দুপাশে পাঁচ থেকে সাতটি ঝিল্লি রয়েছে। এসব ঝিল্লির অবস্থান বেশ খাড়া খাড়া।

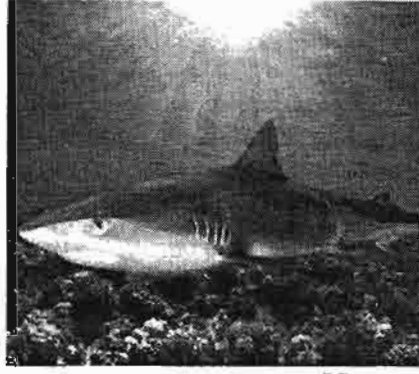
আবার কোনো কোনো প্রজাতির হাঙ্গরে ঝিল্লির পথটি এক প্রকারের আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে ফলে পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেই পানি দেহ থেকে বের করতে হাঙ্গরকে ছুটেতে হয়। এভাবে ছুটে চলার মধ্যে হাঙ্গরের ঝিল্লিতে অবস্থানরত পানি বেরিয়ে যায়। হাঙ্গর মূলত কর্ডাটা পর্বের প্রাণী। বিজ্ঞানীরা সমস্ত প্রাণীজগতকে মোট ১০টি পর্বে ভাগ করেছেন। সর্বশেষ পর্বের নাম কর্ডাটা। আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে উক্ত কর্ডাটা পর্বকে আরো ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই সাতটা ভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম কেনড্রিকথিস বা তরুণাঙ্গি। হাঙ্গর এ পর্বে অবস্থিত। বিজ্ঞানীরা হাঙ্গরের বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন *Scotidom Sorrakwah*। হাঙ্গরের শরীরের তুলনায় চোখ অনেক ক্ষুদ্রাকৃতির। এদের চোখের রেটিনায় কোষের সংঘর্ষ কম থাকার কারণে এরা অনেক ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বেশকিছু বিষয় চিনতে বা বুঝতে পারে না। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে হাঙ্গরের দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট প্রখর। হাঙ্গরের দৃষ্টিশক্তির অন্যতম সুবিধা হলো এরা আবছা আলোতে এবং ঔজ্জ্বল্যের মাঝে একইভাবে দেখতে পায়। চেনার অক্ষমতার কারণে অনেক সময় এদের মাঝে কিছু ভুলত কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ম্যাকাও গোষ্ঠীর হাঙ্গরগুলোকে মাঝে মাঝে লৌকা বা হাঙ্গরের অংশ বিশেষ কামড়ানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়। হাঙ্গরের চোখ সামান্য চেরা। কিছু কিছু হাঙ্গরকে দেখলে মনে হয় তাদের চোখ যেন শরীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এদের চোখের কোটর থেকে অক্ষিগোলক কিছুটা সরানো, তাই এরা সহজেই চোখটিকে চারদিকে ঘেঁরাতে পারে এবং শিকার কিংবা শত্রুকে সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারে। হাঙ্গরের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। তা হলো অনেকেই মনে করেন, হাঙ্গর বেশ ভয়ঙ্কর প্রাণী। প্রায়ই দিনেমায় এমনটি দেখা যায়। এ ধরনের অনেক চলচ্চিত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন আলোচিত বা পুরস্কৃত হয়েছে তেমনই হয়েছে সমালোচিতও। বিজ্ঞানীদের মতে সব প্রজাতির হাঙ্গর হিংস্র নয়। সাধারণত মা হাঙ্গরদের প্রজননের সময়টাতে প্রায় সব সময়ই হিংস্ররূপ ধারণ করতে দেখা যায়। সেটা অবশ্য সন্তানদের রক্ষার্থে। অবশ্য এটাও ঠিক নেহায়েৎ প্রয়োজনের তাগিদে না হলে সচরাচর এরাও আক্রমণ করে না। তবে হিংস্র প্রজাতির হাঙ্গর যে নেই তা নয়। তবে মানুষের





হোয়াইট শার্ক বা সাদা হাঙ্গর



টাইগার হাঙ্গর

পৃথিবীতে চলমান শার্ক নামে দ্রুত গতিসম্পন্ন হাঙ্গর ঘণ্টায় প্রায় ৩২ মাইল বেগে ছুটতে পারে। টাইগার শার্ক ভয় পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো এরা বেশ একরোখা টাইপের। কোনো শিকারের প্রতি নজর পড়লে এরা সহজে পিছু ছাড়ে না।

সচরাচর আক্রমণ করার কথা তেমন শোনা যায় না। তবে রক্তের গন্ধ পেলে এরা কিছুটা হিংস্র হয়ে ওঠে এ কথা সত্যি। আসলে রক্তের প্রতি এদের কিছুটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। হাঙ্গরের ত্রাণশক্তি বেশ প্রবল। সে কারণে সামান্য রক্তের গন্ধ পেলে এদের ছুটে আসতে তেমন দেরি হয় না। রক্তের ক্ষীণধারার সন্ধান পেলেই তারা সূচারুভাবে শিকারের দিকে এগিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে আহত প্রাণী যেই হোক মানুষ কিংবা অন্য কিছু তা নিয়ে এরা ভাবে না। অনেক সময় আক্রান্ত প্রাণী দুর্ধর্ষ কিংবা আকারে বড় হলে এদেরকে দলবদ্ধে আক্রমণ করতে দেখা যায়। অসম্ভব হলে এরা বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। আক্রান্ত প্রাণীটি রক্তক্ষণের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লে এরা আক্রমণ শুরু করে। এদের ক্ষুরধার চোয়াল মুহূর্তের মধ্যে এক নিমিষে শিকারের যে কোনো অঙ্গ ছিড়ে ফেলতে পারে। এদের দাঁতের ক্রিয়া এতটাই ভয়ঙ্কর যে, আক্রান্ত ব্যক্তি বা প্রাণীটি বেঁচে ফিরে আসতে পারলেও এর দহন যন্ত্রণা তাকে দীর্ঘদিন ভোগ করতে হয়। অনেকে বলে থাকেন হাঙ্গরের দাঁত এত তীক্ষ্ণ যে, তা দিয়ে দিব্য রেজরের কাজ চলিয়ে নেয়া যাবে।

ভয়ঙ্কর হাঙ্গরদের মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক বলে অভিহিত করা হয় হোয়াইট শার্ককে (White Shark)। এছাড়াও রয়েছে টাইগার শার্ক (Tiger Shark)। এটির হিংস্রতা এমনই যে, এরা প্রয়োজনবোধে অন্যান্য প্রাণীসহ স্বীয় হাঙ্গর প্রজাতি খেয়ে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না। আমাদের দেশের তীরে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরেও এ ধরনের হাঙ্গর দেখতে পাওয়া। এদের গায়ে সাদা-কালো ডোরা থাকে। এরা লম্বায় প্রায় ১৮ ফুট হয়ে থাকে। টাইগার শার্ককে শান্ত প্রকৃতির চলাফেরায় পর্যবেক্ষণ করা গেলেও শিকারের সময় এদের প্রকৃত রূপ দেখা যায়। এদের ক্ষীপ্রতা ও দ্রুততা চোখে পড়ার মতো। অবশ্য পৃথিবীতে চলমান শার্ক নামে দ্রুত গতিসম্পন্ন হাঙ্গর

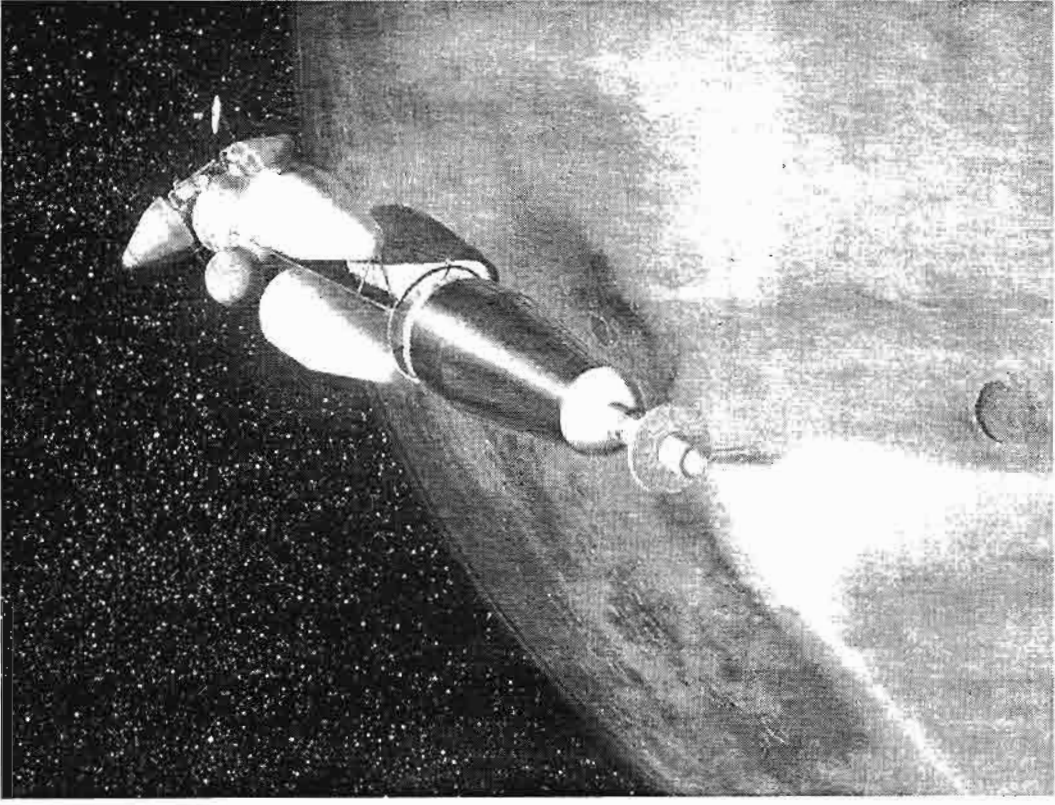
প্রজাতি দেখা যায়। এরা ঘণ্টায় প্রায় ৩২ মাইল বেগে ছুটতে পারে। টাইগার শার্ক ভয় পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো এরা বেশ একরোখা টাইপের। কোনো শিকারের প্রতি নজর পড়লে এরা সহজে পিছু ছাড়ে না। আরব সাগরে ম্যাকো নামে আরেক প্রকৃতির হাঙ্গর দেখা যায়। এরা সত্যিকার অর্থেই হিংস্র এবং দুর্ধর্ষ। সাধারণত গরম পানিতে এদের বেশি দেখা যায়। এরা সাধারণত বার-তেরো ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এরা এতটাই হিংস্র মাঝে মাঝে রাগের বেশে কোনো শিকারের শেষপর্যন্ত বেঁধে যায় এবং সুযোগ না পেলে শিকারের বাহন বা যা পায় তার উপরেই আক্রমণ করে বসে। হাঙ্গরের চোয়াল বেশ শক্ত এবং ক্ষুরধার। চোয়াল ফাঁক করলে অনেক বড় হয়ে যায়। মূলত সমুদ্রে অবস্থানরত বিভিন্ন ধরনের মাছ খেয়ে থাকে হাঙ্গররা। আবার অনেক হাঙ্গর বিভিন্ন স্কুইড, অক্টোপাস কিংবা শামুক-খিনুক খেয়ে থাকে। কোনো হাঙ্গরকে সাগরের মাঝে জন্মানো প্রাকটন কিংবা নানা জলজউদ্ভিদ খেতে দেখা যায়। আবার হিংস্র কিছু হাঙ্গরকে প্রয়োজনবোধে অন্যপ্রজাতির হাঙ্গরকেও খেয়ে ফেলতে দেখা যায়।

হাঙ্গরের দেহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এরা সহজে রোগশোকে আক্রান্ত হয় না। বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, হাঙ্গর ক্যাপারে আক্রান্ত হয় না। ক্যাপারে বলতে আমরা মূলত বুঝে থাকি দেহের অভ্যন্তরে ওঠা কিছু অস্বাভাবিক কল্যাণ বা কোষ। অবশ্য ক্যাপারের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে বা গবেষণার প্রয়োজনে যত হাঙ্গরকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তাদের কারো দেহের অভ্যন্তরে কোনো অস্বাভাবিক বা বিকৃত কোষ দেখা যায়নি। এ বিষয়টি বিজ্ঞানীরা এখনো উদঘাটন করতে পারেনি। এটি সম্ভব হলে হয়ত সেটি মানুষের কাজে লাগানো যেত। তাহলে হয়ত প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ ক্যাপারে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত না। অবশ্য কিছু কিছু

বিজ্ঞানীদের মতে হাঙ্গরের ক্যাপারে হয়। কিন্তু তা হাঙ্গরের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে বিস্তার লাভ করতে পারে না। আমাদের দেহেও অবশ্য ক্যাপার প্রতিরোধকারী জিন রয়েছে। তাহলে বলা যায়, সেক্ষেত্রে এটি হাঙ্গরের মতো এতটা শক্তিশালী নয়। সে কারণেই হয়তো মাঝে মাঝে কারো স্বজন বা পরিচিত জন ক্যাপারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ খবর আমাদের শুনতে হয়। হাঙ্গর আকারে বিশাল কিংবা যতটাই হিংস্র হোক না কেন। এটি মানুষের সাথে পেরে ওঠে না।

দেশে কিংবা বিদেশে প্রচুর শার্ক কিংবা হাঙ্গর শিকারীদের হাতে প্রতিনিয়ত বধ হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেটোয়া সমুদ্র বিচে উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাঙ্গরের মাংস খোলাবাজারে বিক্রয় হতে দেখা যায়। আমাদের দেশেও সমুদ্র তীরগুলোতে কিংবা গভীর সমুদ্রে প্রচুর হাঙ্গর ধরা পড়ে। দেশের রপ্তানি পণ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ হাঙ্গরের ঝাঁটকি, যা দেশের পক্ষে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া হাঙ্গরের পাখনার সুপ পৃথিবীর অনেক দেশেই বেশ জনপ্রিয়। এটির প্রচলন অবশ্য আমাদের দেশে নেই। হাঙ্গরের তেল বা শার্ক লিভার অয়েল মানুষের জন্য বেশ উপকারী। আগে হাঙ্গরের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হতো। অবশ্য যুগের আধুনিকায়নের সাথে সাথে সেটি এখন আর দেখা যায় না। হাঙ্গরের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কাজে, ওষুধ তৈরিতে, গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। আরেকটি নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথাও শোনা যায়— তা হলো জ্যাক হাঙ্গর দুহাতে চেপে ধরে ঘষে ঘষে জাহাজের তেল মচা পরিষ্কার করা হয়। এর কারণ হাঙ্গরের সারা দেহে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখা অংশ রয়েছে। এর নাম ভেন্টিকল। এ খসখসে চামড়া মানুষের হাতে তৈরি শিরিষ কাগজের চেয়ে নাকি আরো বেশি কার্যকর। এরূপ ব্যবহার সত্যিই অমানবিক।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অযাচিত ব্যবহার এবং নানা কারণে-অকারণে হাঙ্গর বধের জন্য এদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। যদিও হাঙ্গরের প্রজনন ক্ষমতা প্রচুর। কেননা এক একটি হাঙ্গর একসাথে প্রায় সত্তর আশিটি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশেই শিকারী বা জেলেরা হাঙ্গর বধের পর এর পেটে বাচ্চার অস্তিত্ব বুঝতে পারলে সেগুলো অবমুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে অবশ্য তেমনটি খুব একটা দেখা যায় না। তবে আশার কথা সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর অনেক দেশই এ ব্যাপারে বেশ সোচ্চার। গ্রিনপিসের যতো পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে বেশ সচেষ্ট। সুতরাং চীন, জাপান, নরওয়ে, স্পেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে হাঙ্গর বধের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। অনেকেই এগিয়ে এসেছে ৪০ কোটি বছর ধরে বিচরণরত এ প্রাণী রক্ষা করার জন্য হয়ত সবার সম্মিলিত সহযোগিতা পেলে এটির বিচরণ সমুদ্রক্ষেত্রে অব্যাহত থাকবে আরো বহুদিন।



# ভ্যাম্পায়ারের নক্ষত্রযাত্রা

সরোয়ার হোসেন

পৃথিবীর সব মানুষ মেরে, কিছু মানুষের জন্য তার মায়া হচ্ছে, এ কথাটা ক্যাপ্টেনকে সে বলতে পারছে না। বললে ক্যাপ্টেন হাসবে। গালিও দিতে পারে।

পুরো পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটাই মহাকাশযান। তারপরও তারা জিতেছে। খুব সহজেই জিতেছে। খবরটা শুনে খুশী হবেন স্মিট। বসতি স্থাপনের জন্য আরেকটা গ্রহ। গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য আছে কিছু মানুষের নমুনা। এ মানুষগুলো আশ্চর্য রকমভাবে বেঁচে গেছে। তাদের আক্রমণের হাত থেকে কেউ বাঁচেনি। শুধু ওরা বেঁচে গেছে। হ্যাঁ, স্মিট খুশী হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাকাশযানটা বিশাল। তাই তার কন্ট্রোলরুমটাও বেশ জটিল। চারদিক নানা রকমের ক্রিন। নানা রকম শব্দ। নানা রকম আলো। দুজন আকটুরিয়ান কথা বলছে।

‘পৃথিবীর মানুষগুলো কেমন আছে, ডাক্তার?’ জিজ্ঞেস করল

ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনের বয়স ডাক্তারের চেয়ে বেশি।

‘তারা শুধু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে, ক্যাপ্টেন। তারা কিছুই খাচ্ছে না। তারা গার্ডদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে কম। তারা বোধ হয় এ ট্রিপে বাঁচবে না।’ ডাক্তার বলল বিষণ্ণভাবে। পৃথিবীর সব মানুষ মেরে, কিছু মানুষের জন্য তার মায়া হচ্ছে, এ কথাটা ক্যাপ্টেনকে সে বলতে পারছে না। বললে ক্যাপ্টেন হাসবে। গালিও দিতে পারে।

‘তারা দুর্বল। তাদের শরীরের গঠনপ্রণালী হয়তো এর জন্য দায়ী। ওদের সাথে আমাদের কিছুটা মিল থাকলেও ওদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা খুব শক্তিশালী



প্রজাতি।' ক্যাপ্টেন অর্ধৈকভাবে ডেকের ওপর আঙ্গুল নাড়াচ্ছে, যেন সে ড্রাম বাজাচ্ছে। 'তারা মাঝা মাঝে— এটা হতে দেয়া যাবে না। জোর করে খাওয়াও ওদের। ওদের জন্য আমাদের বিজ্ঞানীরা খুব আত্মহু নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওরা বাঁচল কীভাবে?'

ডাক্তার এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। কারণ উত্তর সে জানে না। সে শুধু বলতে লাগল, 'তাদের শরীরে তেমন একটা রোগ নেই। এমনকি রেডিয়েশনের পোড়া দাগও তাদের শরীরে নেই। কিন্তু তারা দুর্বল হয়ে পড়ছে।' 'তাদের বাঁচিয়ে রাখো, ডাক্তার,' আদেশ দিল ক্যাপ্টেন।

ডাক্তার কোনো কথা বলল না। ক্যাপ্টেনের শক্ত চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'ক্যাপ্টেন, আপনি কি কখনো স্বপ্ন দেখেছেন?'

'স্বপ্ন' অবাক হলো ক্যাপ্টেন। 'স্বপ্ন দেখতে নিষেধ করেছেন স্মার্ট। তাছাড়া স্বপ্ন আমাদের দুর্বল করে দেয়।'

ডাক্তার হাঁটতে লাগল উজ্জ্বল করিডোর দিয়ে, যেখানে গার্ডরা দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রের মতো। ওরা যার যার কাজে দক্ষ। সবার পরনে একই রকমের এবং একই রঙের ইউনিফর্ম। সবার চেহারাও এক রকম। মনে হচ্ছে একজনের কার্বন কপি অন্যান্য। তাকে দেখে এক গার্ড স্যালুট দিয়ে দরজার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল। গার্ডকে কেমন জানি অসুস্থ মনে হচ্ছে।

'স্যার, নিজেকে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে,' বলল গার্ড। 'একটু বিশ্রাম নিতে পারলে...'

কড়া চোখে গার্ডের দিকে তাকাল ডাক্তার। তারপর বলল, 'না, এখন বিশ্রামের সময় নয়, এ নিয়ম তুমি ভালোমতোই জান।'

'কিন্তু স্যার!'

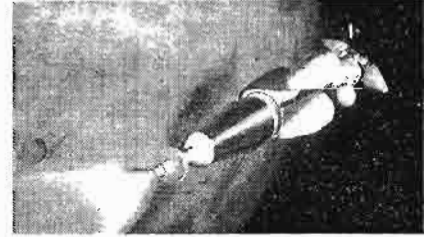
'ছুটির পর সিকবে-তে রিপোর্ট কর। তোমার সাইকো-এনালিসিস দরকার।' ডাক্তার গার্ডের চোখের দিকে তাকাল। কোনো কারণে ভয় পেয়েছে বোঝা। তাকে কেমন জানি রক্তশূন্য মনে হচ্ছে। ডাক্তারের দৃষ্টিভঙ্গি হলো তাহলে কি এদের সংখ্যা বাড়ছে?

নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কারণ না খেলেও কোনো এক রহস্যময় কারণে তারা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে।'

জোর করে হাসল ডাক্তার। তাহলে মহাকাশযানের পরিবেশের সাথে ওরা মানিয়ে নিচ্ছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু কোনো কিছু না খেয়ে...। ব্যাপারটা তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে ডাক্তার তার অফিস কাম সিকবে-তে প্রবেশ করল। দরজা বন্ধ হলো। চেয়ারে আরাম করে বসল ডাক্তার।

করিডোরে ছোট্ট ছুটির শব্দ। হঠাৎ করে দরজায় একটা নিঃশব্দ আলো ঝলকানি। দরজাটা বিস্ফোরণে খুলে গেছে। ডাক্তার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে দাঁড়াল। আচমকা এ ঘটনায় সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অসুস্থ গার্ড। তার হাতে পিস্তল। হাঁপাচ্ছে সে। তার মাঝেই সে বলতে লাগল, 'ডাক্তার, সরে দাঁড়ান। ওদের একজন আমাকে তাড়া করছে। দেয়াল বেয়ে ওটা আসছে। ইচ্ছা করলে ওটাকে আপনিও দেখতে পারেন। ওটা আমার

চোখজোড়া এখনো খোলা আছে। মৃত্যু দেখে ডাক্তার ভয় পেল না। ভয় পেল মৃত্যুর কারণের কথা চিন্তা করে। জীবনে সে অনেক রকম মৃত্যু দেখেছে— স্বজাতি ও অন্য প্রজাতির। তবে এ মৃত্যু তার জন্য সুখকর হবে না।



'স্যার, ক্রুদের অনেকেই অভিযোগ করেছে যে, ..., ' ডাক্তার কথাটা শেষ করতে পারল না।

'অভিযোগ! অভিযোগ করা নিষেধ, এ কথাটা তুমি বেশ ভালোমতোই জান,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন। 'ঠিক আছে, বল কী হয়েছে?'

'খুবই সামান্য ব্যাপার, স্যার। আপনাকে জানাব কিনা ভাবতে হয়েছে আমাকে। পরে ঠিক করলাম ব্যাপারটা আপনাকে জানানো দরকার। ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল। ক্রুদের অনেকেই দুঃস্বপ্ন দেখছে। মনে হচ্ছে ওরা মহাকাশ-ভীতিতে ভুগছে। অনেকেই প্রথমবারের মতো মিশনে যোগ দিয়েছে। তাই এ রকম হতে পারে।'

'ওদের লিস্ট তৈরি কর,' বলল ক্যাপ্টেন। 'তারপর ওদের সার্ভিস থেকে বাদ দাও। দুর্বলদের জায়গা এখানে নেই, এটা তুমি ভালোমতোই জান, ডাক্তার।'

'জি, স্যার,' ডাক্তার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

'একটু দাঁড়াও,' বলল ক্যাপ্টেন। 'ওদের স্বপ্নের বিষয়বস্তু জানতে পেরেছ?' ক্যাপ্টেনের চোখে কৌতূহল।

'ওরা স্বপ্নে রক্ত দেখে স্যার,' বলল ডাক্তার। 'তারা দেখে মাথার খুলি, বাদুড় আর বুড়ো মহিলা। পালানোর সময় ওদের ছায়াময় কিছু একটা আক্রমণ করে— এটা দেখে ওরা।' বলে ডাক্তার কন্ট্রোলরুম থেকে বের হলো।

চিন্তিত চেহারা নিয়ে ডাক্তার প্রিজন সেলগুলো দেখতে লাগল। প্রথম সেল, দ্বিতীয় সেল, পনেরতম সেল, সবগুলোর অবস্থা একই রকম। বন্দিরা ক্ষুধার্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্করভাবে। মনে হচ্ছে ওগুলো মৃত মানুষের চোখ। সেলের সংখ্যা মোট তেইশ। প্রতি সেলে আছে দুজন করে বন্দি। তার মানে মোট বন্দির সংখ্যা ছেচত্রিশ।

মোট বিরানব্বইটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে যেন। এটা ভাবতেই ডাক্তারের শরীরের ভেতরের পুরোটা কেঁপে উঠল অজানা আতঙ্কে। পাঁচ বিলিয়ন মানুষের মাঝে ওরাই শুধু বেঁচে গেছে অলৌকিকভাবে। আশ্চর্য ব্যাপার!

একজন গার্ড তার দিকে এগিয়ে এল। ডাক্তার তার কাছ থেকে বন্দিদের অবস্থা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিল। 'জোর করে খাওয়াতে হবে,' বলল ডাক্তার অর্ধৈকভাবে। 'ভিটামিন লাইটের ব্যবস্থা করো। ইনজেকশন দাও। মোট কথা, ওদের খাওয়াতে হবে। ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর এক নম্বর সেলের গার্ডকে অসুস্থ মনে হলো। তাকে আলাদা করার ব্যবস্থা করো।' খামল ডাক্তার। তাকাল গার্ডের দিকে। বেঁটা কিছু একটা বলতে চায়। 'তুমি মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাচ্ছ?'

'গার্ডদের মাঝে বেশ ক'জন মাঝে মাঝে ভয়ে লাফিয়ে উঠছে স্যার,' বলল গার্ড। 'বন্দিদের

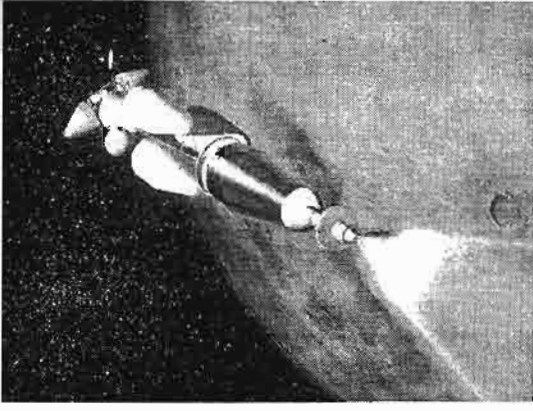
জানা আসছে।' গার্ড এবার চোঁচাচ্ছে। হঠাৎ করে সে ফ্লোরে পড়ে গেল। পিস্তলটা নিজের দিকে তাক করল। ট্রিগার চোপে দিল সে- ডাক্তারকে কিছু বলার সুযোগ দিল না।

তার চেহারা পুড়ে কালা হয়ে গেছে। চোখজোড়া এখনো খোলা আছে। মৃত্যু দেখে ডাক্তার ভয় পেল না। ভয় পেল মৃত্যুর কারণের কথা চিন্তা করে। জীবনে সে অনেক রকম মৃত্যু দেখেছে— স্বজাতি ও অন্য প্রজাতির। তবে এ মৃত্যু তার জন্য সুখকর হবে না। স্মার্টদের বোঝানো যাবে না। সব দোষ তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ভয়ানক শাস্তি তার জন্য অবধারিত হয়ে আছে। দিশেহারা হয়ে সে ক্যাপ্টেনের কাছে চলে এল। মহাকাশযানের এ বিপর্যয়কর অবস্থায় যা করার ক্যাপ্টেন করবে— এটা ভেবে ডাক্তার কিছুটা শান্ত হলো।

ক্যাপ্টেন সব শুনে বলল, 'বেটা এ কাজটা করল কেন?'

'স্যার, ভুলে যাবেন না আমরা মহাকাশে আছি।'

'আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক মহাকাশে আছে!' চোঁচিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'তাদের মাঝে কেউ তো আত্মহত্যা করেনি। আমাদের সংস্কৃতিতে আত্মহত্যা বলতে কিছু নেই। এটা নিয়মের বাইরে। তাই আমি স্পষ্টভাবে জানতে চাই, সে কেন আত্মহত্যা করল। তাছাড়া যার কথা তুমি



ক্যাপ্টেন দরজা বন্ধ করে তার কেবিনে কমল মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছে সম্রাটরা সারি সারি চেয়ারে বসে আছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কেন এটা ঘটল? ওটা কেন ঘটল? ক্যাপ্টেন হিসেবে তুমি কোথায় ছিলে? নানা প্রশ্ন। সে কোনো উত্তর দিতে পারছে না।

বললে, সে তো একজন দক্ষ গার্ড। অনেক মহাকাশ অভিযানে সে ছিল।

'আমার মনে হয়, আসল সমস্যা বন্দিদের নিয়ে, স্যার,' নিজের সন্দেহের কথাটা শেষমেশ বলেই ফেলল সে। 'যেসব গার্ড বন্দিদের পাহারা দিচ্ছে, তারাই কেবল অভিযোগ করছে।'

'বন্দিদের আমিও দেখেছি,' বলল ক্যাপ্টেন। 'বাজে কথা রেখে আসল কারণ খুঁজে বের করো। লার্শের পোস্টমর্টেম করো। তার মাথায় কোনো গুলোগুল ছিল কিনা সেটা বের করো।'

'সেটা করেছি স্যার,' বলল ডাক্তার। 'তার মাথাটা রেখে দিয়েছি।'

'আবার কর। নিশ্চয় তার মাথায় কোনো সমস্যা ছিল। সেটা বের করতে হবে। তারপর সেটা যাতে কারো মাথায় না থাকে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে। বোঝা গেছে আমি কী বলেছি?'

ডাক্তার মাথা নিচু করে বের হয়ে এল। সে দ্রুত তার অফিসে চলে গেল। চেয়ারে বসে আয়নার দিকে তাকাল ডাক্তার। নিজেকে কেমন জানি অপরিচিত মনে হচ্ছে। চোখ বসে গেছে। চুল এলোমেলো। প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। চোখ বুজে এল। ঘুমিয়ে গেল সে। সাথে সাথে দেখতে শুরু করল দুঃস্বপ্ন- যার কথা সে কেবল শুনেছে।

তার শরীর বেয়ে উঠছে পোকামাকড়। বিশাল একটা ইঁদুর তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে তার গলায় কামড় বসিয়েছে। তার চারপাশে বাদুড় উড়ছে- লাল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। নানা বয়সের নারীরা খিল খিল করে হাসছে। আর চারদিকে ছায়াময় অবয়ব। ছায়াগুলো তার অরক্ষিত শরীরের দিকে এগিয়ে আসছে। ছায়ার মাঝে সে খুঁজে পাচ্ছে নির্দিষ্ট একটা আকৃতি।

চোখ মেলল ডাক্তার। যে দুঃস্বপ্নটা সে দেখছিল, সেটা এই এখন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। ওরা হাসছে। ডাক্তারের মস্তিষ্ক আর ধৈর্য ধরতে পারল না। হাতের কাছে একটা ডাক্তারি ছুরি ছিল, সেটা দিয়ে সে তার হাতের রগ কেটে ফেলল। আর হাসতে লাগল পাগলের মতো। তারপর পড়ে গেল ধাতব টেবিলের ওপর।

'বিদায় ডাক্তার,' বলল একটা কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বর সারা রুমে প্রতিধ্বনি তুলল। ডাক্তারের হাত

থেকে অঝোর ধারায় রক্ত পড়তে লাগল।

রক্তের নেশায় পাগল হলো ওরা। রক্তের মাগে একে একে আসতে লাগল সবাই।

এরপর ঘটতে লাগল এমন সব ঘটনা যা আগে এ মহাকাশযানে কোনো দিন ঘটেনি।

কয়েকজন ক্রু মহাকাশযানের জানালা খুলে বাইরে লাফ দিল। অনেকে আবার এটমিক ইঞ্জিনে লাফ দিয়ে পুড়ে মরল। যে যেভাবে পারল পালাতে লাগল। চিরস্থায়ী যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুর সাময়িক কষ্ট অনেক সময় বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। এ মহাকাশযানে এখন সে অবস্থা বিব্রাজ করছে।

মহাকাশযানের করিডোরে প্রতিধ্বনি তুলছে মরণচিৎকার। সেই সাথে ভেসে আসছে মহা আনন্দের উল্লাস। ক্যাপ্টেন দরজা বন্ধ করে তার কেবিনে কমল মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছে সম্রাটরা সারি সারি চেয়ারে বসে আছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কেন এটা ঘটল? ওটা কেন ঘটল? ক্যাপ্টেন হিসেবে তুমি কোথায় ছিলে? নানা প্রশ্ন। সে কোনো উত্তর দিতে পারছে না। এ দৃশ্যটা তাকে বেশ কাহিল করল। কারণ মহাকাশযানে যাই খটুক, সব দায়-দায়িত্ব ক্যাপ্টেনের। আর সে কিনা কমল মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে।

মাথা থেকে কমল সরাল ক্যাপ্টেন। চোখের সামনে দেখতে পেল একটা বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে আছে। স্পেসিম্যান লিস্টে তার নাম লেখা আছে এডাম স্মিথ হিসেবে। সে হচ্ছে বিশতম স্পেসিম্যান। লোকটা হাসল। দুটি তীক্ষ্ণ দাঁত বেরিয়ে পড়ল। সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে তাজা রক্ত। সে বলল, 'হ্যাঙ্গো, ক্যাপ্টেন।'

'গার্ড! চিৎকার দিল ক্যাপ্টেন। 'কোথায় তোমরা?'

'ওরা তোমার কথা শুনেতে পারবে না,' বলল লোকটা। সে বসল একটা চেয়ারে। ছায়াময় মানুষগুলো আকার পেতে শুরু করেছে। তারা এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেনের দিকে।

ক্যাপ্টেন কঁাদতে লাগল, যদিও সে জানে, নিয়মানুসারে ওরা কঁাদতে পারে না। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ক্যাপ্টেন প্রশ্নটা করল, 'তোমরা কী?'

'আমরা এমন কিছু, যা সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, প্রশিক্ষণও নেই,' হেসে বলল লোকটা। তোমাদের বললেও তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারতে না। কারণ, আমাদের মতো কিছু যে থাকতে পারে, সেটা ছিল তোমাদের ধারণার বাইরে। অনেক আগে আমরা মানুষ ছিলাম। এখন আমাদের ভ্যাম্পায়ার বলে। তবে এখন থেকে আমরাই তোমাদের নতুন সম্রাট। আমরাই তোমাদের গ্রহের ভবিষ্যৎশাসক।' থিক থিক করে হাসল লোকটা। তীক্ষ্ণ দাঁতজোড়া তো অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছে।

'পৃথিবীর ওপর তোমাদের আক্রমণটা চমৎকার হয়েছে,' বলল একই লোক। ছায়ারা কাঁপছে আবার আকার নিচ্ছে। 'তোমাদের আক্রমণে হাত থেকে কোনো মানুষ বাঁচতে পারেনি। পারার কথাও নয়। আমরা ছিলাম কবরে— অনেক আগে থেকে। আমাদের বুকের ভেতর ঢুকানো ছিল কাঠ- সেটা ছিল স্বর্গপিতৃ বরাবর আমাদের মারার এই একটাই উপায় আছে। তোমাদের বিস্ফোরণের আশুন এত ভয়াবহ ছি- যে, সেটা মাটির নিচে আমাদের বুকের মাঝে ঢুকানো কাঠগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাস, আমরা বের হয়ে এলাম। তোমরা ধরে তুললে মহাকাশে। কিন্তু আমরা কে, এটা জানার চেষ্টা করলে না।'

লোকটা একটা হাত উঁচু করল। বাকি ছায়াময় আকারগুলো এবার নির্দয়ভাবে ঝাপিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের ওপর।

ক্যাপ্টেন চিৎকার দিতে শুরু করেছে।

সেই চিৎকারের সাথে মিশে গেছে মহাকাশযানের মেশিনের গুঞ্জন।

মহাকাশযানটা অটোপাইলটে সেট করা আছে। কোর্স অনুযায়ী এটা গতবৎ পৌঁছে যাবে। আলোরগতিতে এটা এখন মহাশূন্যের বুক চিড়ে ছুটছে।

এভাবেই কোনো এক সময়ে পৃথিবীর ভ্যাম্পায়াররা পৌঁছে গিয়েছিল আরেক নক্ষত্রলোকে। তারপর পৃথিবীর কিংবদন্তীর মতো সেখানেও তারা সৃষ্টি করেছিল আরেক কিংবদন্তীর। আর এ কারণেই ট্রান্সিলভেনিয়াতে ভ্যাম্পায়ারদের আর দেখতে পাওয়া যায় না।